দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চা : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

উপন্যাসভিত্তিক আলোচনা

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট

২. রাজর্ষি

৩. চোখের বালি

৪. নৌকাডুবি

৫. গোরা

৬. চতুরঙ্গ

৭. ঘরে-বাইরে

৮. যোগাযোগ

৯. শেষের কবিতা

১০. দুই বোন

১১. মালঞ্চ

১২. চার অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে বহুবিধ সমালোচনার ধারা তাঁর উপন্যাস রচনার সূচনাকাল থেকেই যে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল সে বিষয়ে আমরা সকলেই কিছুটা অবগত রয়েছি। তাই রবীন্দ্র-উপন্যাসকে নতুন কোনো তত্ত্ববিশ্বের নিরিখে বিশ্লেষণের পূর্বে উপন্যাসকেন্দ্রিক চর্চার যে ধারা আবহমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার ধরন বুঝে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই তাগিদ থেকেই আমরা বর্তমান অধ্যায়ে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে সচেষ্ট হব। এখানে মূল আলোচনাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বেই যে কথাটি বলে নেওয়া একান্ত আবশ্যক তা হল রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে সমালোচনামূলক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, রচনার সংখ্যা অগণন। এই অসংখ্য চর্চাধারার নানামুখী আলোচনার প্রতিটির উল্লেখ এবং বিশ্লেষণকে সন্দর্ভপত্রে স্থান দিতে গেলে তা সম্পূর্ণ পৃথক একটি গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই বিষয়টিকে বিবেচনা করে আমরা এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র অতি-গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচনাগুলির প্রতিই আলোকপাতের চেষ্টা করব।

গবেষণাক্ষেত্রের স্বচ্ছতা রক্ষার প্রশ্নে আমাদের এও জানিয়ে রাখা কর্তব্য বিগত প্রায় দুই বছর সময়কাল অতিমারী পরিস্থিতি ও গৃহবন্দীদশার কারণে আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচনা বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি, ফলে সেই গ্রন্থগুলির বিশ্লেষণ বা উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি— গবেষণাকর্মে আমাদের এই অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণত অনিচ্ছাকৃত।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পাশাপাশি কিংবা সদ্য গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার সমান্তরালে সেগুলি নিয়ে যুগপৎ পাঠক ও সমালোচকমহলে যে চর্চা চলেছিল তার অভিমুখ স্বাভাবিকভাবেই ছিল দ্বিবিধ— ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। অধিকাংশক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের যে সমালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়ে চলছিল তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল নেতিবাচকতা। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল রবীন্দ্র-উপন্যাসের গঠন (form) ও বিষয় (content)। সমসাময়িককালে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য যে কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক সমালোচনার শিকার হয়েছিলো তার অন্যতম ছিল সমকালীন পাঠকের রুচি ও দীক্ষা। রবীন্দ্রনাথ যখন উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন তখন ছিলেন সমকালের রুচির থেকে এগিয়ে এবং সাহিত্যজীবনের শেষের দিকে গিয়ে তিনি

সমকালীন সাহিত্যগতি, সংরূপের প্রকৃতি ও রুচির দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছেন; এই বাস্তবটিকে মাথায় রেখে আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চা বা সমালোচনার ধারার প্রতি আলোকপাত করতে পারি।

রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং রবীন্দ্র-জীবন বাংলা সাহিত্য জগতে এমনই এক বিষয় যাকে এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। সমকাল এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে বা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে পারে না বাংলাভাষা ও সাহিত্যজগৎ। তাই হয়তো রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে নানাবিধ চর্চার যে ভূরি পরিমাণ উদাহরণ পাওয়া যায় তার তুলনায় বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় ও তত্ত্বকে ঘিরে আলোচনার পরিমাণ যথেষ্ট অপ্রতুল বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনে যে চোদ্দোটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার কোনো কোনোটি সমকালীন সমালোচনার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে স্থান দখল করেছিল বা বলা যেতে পারে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে আলোচিত ও বিতর্কিত হয়েছিল, আবার কোনো কোনো উপন্যাস নিয়ে সমালোচকেরা সেভাবে আলোচনা করেননি। সাহিত্য জীবনের একেবারে সূচনাপর্বে রচিত 'করুণা' এমনই একটি উপন্যাস যা সমকালে কিংবা পরবর্তীকাল কোনো সময়েই সমালোচক বা পাঠকমহলে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। মাত্র ষোলো বছর বয়সে লেখা এই উপন্যাস 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৪-র আশ্বিন থেকে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাস পর্যন্ত প্রকাশিত হলেও পত্রিকায় প্রকাশের সমসাময়িককালে উপন্যাসটি নিয়ে সেভাবে কোনো চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় না। সম্ভবত কিশোর ঔপন্যাসিকের প্রথম প্রয়াস বিবেচনা করেই সমালোচক মহলে এই উপন্যাস সম্পর্কে কোনোরকম গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উত্থাপিত হয়নি। তবে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের বছর ছয়েক পরে একটি চিঠিতে চন্দ্রনাথ বসু এই উপন্যাস সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করে যুগপৎ উপন্যাসটির প্রশংসা এবং সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন, যা পরে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মনে রাখতে হবে চন্দ্রনাথ বসুর এই চিঠি তখন লেখা হয়েছে যখন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরবর্তীকালে 'করুণা'-কে পরিপক্ক উপন্যাসের নিক্তিতে রেখে বিচার করেননি তাই সেই হিসেব মতো 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' থেকেই আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার যে ধারা তার পদাঙ্ককে অনুসরণ করতে পারি।

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— 'করুণা'-র মতো 'বউ-ঠাকুরানীরর হাট'-ও পত্রিকায় প্রকাশের সমসাময়িককালে বা অব্যবহিত পরবর্তীকালে সমালোচক মহলে সেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'জীবনস্মৃতি'-র পাতায় তাঁর প্রথম জীবনে রচিত এই উপন্যাস সম্পর্কে শুধুমাত্র সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে পাওয়া এক প্রশংসাবাক্য সম্বলিত হারিয়ে যাওয়া চিঠির কথা উল্লেখ করেই বক্তব্য শেষ করেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর মধ্যে সুকুমার সেন প্রতাপাদিত্য-সম্পর্কিত ইতিহাসের থেকেও অধিক পরিমাণে খুঁজে পেয়েছেন লেখকের কল্পনার আবেশকে, যার সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়েছে লেখকের শৈশব ও বাল্যকালের স্মৃতি।

শ্রীভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাকালে চারটি ভাগে ভাগ করে উপন্যাসগুলির আলোচনা করেছেন। সমালোচকের মতে উন্মেষপর্বের উপন্যাস তিনটিতেই রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের জলজ স্নিগ্ধতা গদ্যের শুষ্কতাকে প্রায়শই আর্দ্রতায় পর্যবসিত করেছে। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' সম্পর্কে করা সমালোচকের এই মন্তব্য প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-উপন্যাসের উন্মেষপর্বের তিনটি উপন্যাস সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর পাতায় রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিশ্লেষণকালে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমস্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করেছেন। বলা যায় উপন্যাসগুলি সম্পর্কে দু-এক বাক্যে ক্ষেত্র গুপ্ত নিজস্ব ভাবনার পরিচয় রেখেছেন। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এ বঙ্কিমী প্রভাবের পাশাপাশি উপন্যাসটিতে ইতিহাসের তুলনায় কল্পনার আধিক্য এবং প্রস্তুতিকালীন পর্যায়ের প্রচেষ্টার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন ক্ষেত্র গুপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনার পূর্বে প্রবহমান রবীন্দ্রোপন্যাস সমালোচনার রীতি মেনে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পার্থক্যগুলির দিকনির্দেশ করেছেন। একটা কথা এইপর্বে আমাদের মাথায় রাখা দরকার যে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রোপন্যাসের পার্থক্য নির্দেশের এই রীতি প্রায় সমস্ত রবীন্দ্র-সমালোচকই মেনে চলেছেন। কিন্তু প্রতি একটি সমালোচনা গ্রন্থের বিশ্লেষণকালে আমরা এই একই প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করতে করতে অগ্রসর হব, কারণ প্রত্যেক সমালোচক এই প্রসঙ্গেরই আলোচনাকালে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন।

নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থটি সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে চলেছে। এই গ্রন্থে সমালোচক উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "...বৌ ঠাকুরানীর হাটে প্রতাপাদিত্যের নির্মম ক্রুরতা ও হিংস্র ভীষণতার, রামচন্দ্রের নির্বোধ ঔদ্ধত্যের পাশাপাশি যদি বসন্তরায়ের মুক্ত উদার প্রাণের আনন্দময় সারল্য, উদয়াদিত্যের ভাগ্যবিপর্যস্ত জীবনের ম্লানিমার কথা চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইবে শেষোক্ত চরিত্রগুলির সহজ মুক্ত জীবনধারার প্রতিই লেখকের পক্ষপাত বেশি। (রায়। ১৩৫১। পৃ. ২৭৭-৭৯)

এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই স্থানে যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-ধারার প্রধান পার্থক্য নির্দেশের পাশাপাশি গ্রন্থকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন দুই ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের সুরের এই মূলগত পার্থক্য হয়ে যাওয়ার কারণগুলিকেও। এই বিশ্লেষণের পথ ধরে উঠে এসেছে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পাশাপাশি কলকাতা শহরের বদলে যাওয়া চালচিত্র ও ক্রমে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস। এই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এবং ঠাকুরবাড়ির বহুমুখী প্রতিভাসমন্বিত অগ্রজদের মধ্যে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আদর্শকে মেনে নিয়েই তাকে উত্তরণের চেষ্টা যে স্বাভাবিক ছিল তার উল্লেখ করেছেন সমালোচক। পাশাপাশি দুই শতকের আবহাওয়া ও বদলে যাওয়া বাঙালি রুচি-শিক্ষা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সুর স্বাভাবিকভাবেই অগ্রজ ঔপন্যাসিকের তুলনায় বদলে গেছে ক্রমে ক্রমে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী ১'-এ এই উপন্যাসের সমালোচনাকালে উল্লেখ করেছেন,

> "...উদয়াদিত্যের প্রতি লেখকের সহানুভূতির কারণ ছিল; লেখক সম্বন্ধেও তাঁহার পিতা ভ্রাতা আত্মীয়বন্ধুর দল অনুরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে সংসারের মধ্যে কাজে-কর্মে, জ্ঞানে-ধর্মে কোনো দিন বড় হইবেন এ-আশা ত্যাগ করিয়া সকলে তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ কর্যাছিলেন।" (মুখোপাধ্যায়। ১৩৬৭। পৃ. ১৪৪)

রবীন্দ্র-জীবনীকার যে তাঁর রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে জীবনী-নির্ভর সমালোচনার ধারাকেই (birgraphical criticism) প্রাধান্য দেবেন এই সত্যটিকে সমালোচককৃত এই

উপন্যাসের আলোচনার পাশাপাশি অন্যান্য উপন্যাসগুলি সম্পর্কে তাঁর আলোচনার প্রতি আলোকপাত করলেও লক্ষ করা যাবে।

এই উপন্যাসের সমালোচনার ধারায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে এই উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "বসন্ত রায়ের চরিত্রের মধ্যে পরবর্তীকালের ঠাকুর্দা চরিত্রের বীজ লুক্কায়িত।... উদয়াদিত্য অন্তর্বিহারী মানুষ, আপন অন্তরের বেদনা ইনি নীরবে বহন করেন। 'সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে' তার প্রতি কবির নিত্যকালের আগ্রহ। কাঁচা হাতে কম্পিত রেখায় এখানে যাকে অঙ্কিত করেছেন সে মানুষই পরে 'গোরা'র পরেশবাবু, 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ হয়েছে, হয়েছে 'যোগাযোগ'-এর বিপ্রদাস।" (দত্ত। ১৯৫৯। পৃ. ৬৩)

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই মন্তব্যের সূত্রে আমরা বলতে পারি উদয়াদিত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলির স্বভাব-কোমল পুরুষ চরিত্রের বীজ অনুসন্ধানের এই প্রবণতা আরো বহু সমালোচকের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। কিন্তু বসন্ত রায়ের মধ্যে রবীন্দ্র-নাটকের 'আইকনিক' ঠাকুরদা চরিত্রের বীজ খুঁজে নেওয়ার দিশা বিরল। তুলনায় বসন্ত রায়ের চরিত্র যে বালক-রবির স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসা শ্রীকণ্ঠ সিংহের আদলে নির্মিত হয়েছে- এই তথ্যটি বহুবার বহু সমালোচকের সমালোচনায় স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি এও স্মর্তব্য নিখিলেশ বা পরেশবাবু বা বিপ্রদাসের পূর্বসূরী রূপে উদয়াদিত্যের নাম প্রস্তাবিত হলেও প্রতাপাদিত্য বা রঘুপতির উত্তরসূরি হিসেবে কিন্তু কোনো সমালোচকই 'যোগাযোগ'-এর রূঢ় প্রকৃতির চরিত্রের অধিকারী মধুসূদনকে নির্দেশ করেননি। আসলে এই পূর্বসূত্র বা উত্তরসূত্র খোঁজার প্রবণতাটা এসেছে চরিত্রগুলির ধাতুগত মিল বা অমিলের জিজ্ঞাসা থেকেই। উদয়াদিত্য, পরেশবাবু, নিখিলেশ বা বিপ্রদাস— এঁদের চরিত্রের ধাতুগত উপাদান এক হলেও প্রতাপাদিত্য বা রঘুপতির সঙ্গে মধুসূদনের চরিত্রের মূলগত কাঠামোর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং এই কারণেই সে কারো উত্তরসূরি হয়ে ওঠে না।

আমরা এই উপন্যাসটির সমালোচনার ধারার বিশ্লেষণ শেষ করব সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাটির উল্লেখ করে। উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাতের তারা দিনের রবি' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছিলেন ক্ষমতার মোহ, বিষয়বিকার, আত্মম্ভরিতা, অন্যনিরপেক্ষ অকারণ আত্মাভিমান নিজেই মানবিক সমগ্রতার প্রতিবন্ধক। এই মোহগ্রস্ত রাজদম্ভের বিরুদ্ধে প্রজার উত্থান বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে একজন ভারতীয় লেখক একথা বলি বলি করতে পারেন মাত্র, বলতে পারেন না। বলতে গেলে উপন্যাসের মাধ্যমে হবে না, তখন তো হবেই না। তাঁকে নির্মাণ করতে হবে অন্যতর শিল্পমাধ্যম। তার দেরী ছিল পঁচিশ বছর।(প্রায়শ্চিত্ত/১৯০৯)" (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ.৭০)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের সূত্রে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বরাবরই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ছিল তা আমরা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করব; একমাত্র ব্যতিক্রম 'গীতাঞ্জলি'-র অধ্যায়। এছাড়া তিনি বরাবর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি নিজের বক্তব্যকে মান্যতা দিয়ে গেছেন। সাহিত্য রচনার শুরুর দিনে যার প্রকাশ ছিল অস্পষ্ট ও অবিন্যস্ত তা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছন্ন রূপে প্রতিভাত হয়েছে। এই প্রকাশের জন্য 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯২৪) পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়নি, তার আগেই ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'লিপিকা'র বেশ কিছু গদ্য— ভিন্নভাবে হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বনির ঘোষক হয়ে উঠেছিল। এছাড়া নির্দিষ্টরূপে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক সংকটের প্রতি দিকনির্দেশ করেছেন আক্ষরিক অর্থে সেই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধাচারণের বর্ণনা রয়েছে 'গোরা'-র আখ্যানভাগেও; যা ১৯২৪ বা 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

২. রাজর্ষি:— সাহিত্য জীবনের সূচনাপর্বে রচিত দুটি উপন্যাস 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি' সম্পর্কে বলা যায় সমকালের তুলনায় পরবর্তী পর্যায়ের রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার ধারায় এই দুটি উপন্যাস অধিক চর্চিত হয়েছিলো সমালোচক মহলে। আমরা বারে বারে নানা বিশেষজ্ঞের মন্তব্য থেকে বা নিজস্ব একাধিক পাঠেও অনুভব করি 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'-র মধ্যে পাওয়া বঙ্কিমী উপন্যাসের প্রভাবকে যা পরবর্তী 'চোখের বালি' থেকেই অনেকাংশে সংযত রূপ পরিগ্রহ করবে।

এখানে বিশেষরূপে উল্লেখ্য, সমকালে রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা বইয়ের বাৎসরিক সরকারী প্রতিবেদন রচনা প্রকাশের যে ঐতিহ্য বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের দ্বারা সূচিত হয়েছিলো, সেই ঐতিহ্য মেনে ১৮৮৬ সালে লাইব্রেরিয়ান পদে অধিষ্ঠিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'রাজর্ষি' সম্পর্কে যে প্রতিবেদন রচনা করেন তাতে তিনি উপন্যাসে কবি কল্পনার

স্পর্শ অনুভব করার কথা জানান। পরবর্তীকালের সমালোচকরা 'রাজর্ষি'-র প্লটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুটি উপকাহিনির মধ্যে ছোটোগল্পকার রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তির উন্মেষকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

সাধারণভাবে সকল সমালোচক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যেখানে বঙ্কিমের প্রভাবমুক্ত প্রথম উপন্যাস হিসেবে 'চোখের বালি'-র উল্লেখ আসে সেখানে 'রাজর্ষি'-র বিশ্লেষণকালে সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> "রাজর্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রোম্যান্টিক উপন্যাসের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া গিয়াছে।" (সেন। ১৩৫৩। পৃ. ৩৪২)

যদিও পরবর্তীকালে সুকুমার সেনের এই অভিমত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় হয়নি। 'রাজর্ষি'-তে তো নয়ই, এমনকি 'চোখের বালি'-তেও বহু সমালোচক বঙ্কিমী-উপন্যাসের নানা প্রলক্ষণকে খুঁজে পেয়েছেন যার উল্লেখ যথাস্থানে করা হবে। আসলে 'রাজর্ষি' থেকে যুগপৎ বঙ্কিমচন্দ্র ও রোম্যাণ্টিক উপন্যাসের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার প্রতি যে দিক-নির্দেশ করা হয়েছে তার আসল কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অলৌকিকতা, স্বপ্নে পাওয়া আদেশ, আকস্মিকতা, দৈবসহায়, বিবাহ-বহির্ভূত ত্রিকোণ প্রেমের আখ্যানের মতো বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নিজস্ব পদ্ধতি অন্বেষণের প্রচেষ্টা প্রকট হচ্ছিলো ক্রমে। যদিও আধুনিক বহু সমালোচক 'করুণা' থেকেই এই প্রচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন।

যেখানে সুকুমার সেন 'রাজর্ষি' থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধারায় নিজস্ব রীতির প্রলক্ষণগুলির অন্বেষণে রত ছিলেন সেখানে 'বউ ঠাকুরানীর হাট'-এর মতোই সমালোচক ভূদেব চৌধুরী 'রাজর্ষি' সম্পর্কেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পূর্ববর্তী উপন্যাস সম্পর্কে যে মন্তব্য সুকুমার সেনের গ্রন্থে আমরা দেখেছিলাম প্রায় তারই এক অনুরণিত প্রতিধ্বনি আমরা শুনি ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্যে;

> "...কাহিনীর ঐতিহাসিক অংশ এবং কল্পনা মিশ্রিত অংশের মধ্যে সুষমতা বিহিত হতে পারে নি। শুধু তাই নয়, গল্পের অতিবিস্তার এবং শিথিলতাও মূল আবেগকে জমাট বাঁধতে দেয় নি।" (চৌধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২২৫-২৬)

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য-সমালোচনার এক-একটা যুগ আসে, যখন একটি নির্দিষ্ট স্বরের প্রতিধ্বনি নানান রকমফেরের মাধ্যমে অল্প-বিস্তর প্রায় সমস্ত সমালোচকের মধ্যেই শুনতে পাওয়া যায়।

যাঁরা সেই প্রতিধ্বনির প্রতি কর্ণপাত না করে নিজস্ব চিন্তাধারায় সমালোচনা করার চেষ্টা করেন তাঁরাই হয়ে ওঠেন এক ব্যতিক্রমী সমালোচক। যেখানে সুকুমার সেন বা ভূদেব চৌধুরী আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসের প্রতি আলোকপাত করেছেন সেখানে অনেক পরবর্তীকালে এসে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজবেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতটিকে; যে জগতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা" গ্রন্থটিতেও পূর্ববর্তী উপন্যাসের মতোই প্রায় একই মতের প্রতিধ্বনি করে মন্তব্য করেছেন,

> "রাজর্ষি"তেও রঘুপতি-নক্ষত্ররায় অপেক্ষা গোবিন্দমাণিক্য ও কোমল হৃদয় হাসি ও তাতার, জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্যের প্রতিই কবির পক্ষপাত। ... নক্ষত্ররায়ের প্রাক-সিংহাসনলাভের জীবনের মধ্যে কোনও মিশ্র বা বিরোধী গুণের সমাবেশ নাই। তবে সিংহাসনলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে ভিতরে যে মানসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে লেখকের খুব সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় এই অপরিণত ভাবকল্পনার মধ্যেই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। (রায়। ১৩৫১। পৃ. ২৭৯)

একথা সর্বাংশে সত্য যে সিংহাসন লাভের পর নক্ষত্ররায়ের মানসিক অবস্থার যে বিবর্তন রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তাতে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু 'নক্ষত্ররায়ের প্রাক-সিংহাসনলাভের জীবনের মধ্যে কোনও মিশ্র বা বিরোধী গুণের সমাবেশ নাই'— সমালোচকের এই মন্তব্যের সাপেক্ষে বলতে পারি নক্ষত্ররায়ের আপাত সরল চরিত্রের মধ্যে বরাবরই সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল যা তাকে পরবর্তীতে মদগর্বী দায়িত্ব-জ্ঞানহীন অত্যাচারী রাজায় পরিণত করেছে। এ প্রসঙ্গে আমরা সন্দর্ভপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি।

সমালোচক শচীন সেনের 'রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়' রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য ধারা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি উপন্যাসের সমালোচনাও করেছেন, যদিও তুলনামূলকভাবে সংক্ষেপে। সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্বের এই দুই উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন,

> "প্রথম অবস্থায় বঙ্কিমের প্রভাবের ফলে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন— বৌঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত। ইতিহাসের ঘটনা

রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে না— ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে যে নিভৃত রস সঞ্চিত থাকে, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল্যবান।" (সেন। ১৩৪৬। পৃ.২১১)

সমালোচকের ঠিক এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা স্থাপন করতে পারি আমাদের পূর্ববর্তী মন্তব্যকে যা সমালোচক ভূদেব চৌধুরীর 'রাজর্ষি' উপন্যাসটির সমালোচনাকালে উল্লেখ করা হয়েছিলো। সুকুমার সেন, ভূদেব চৌধুরী কিংবা শচীন সেন এঁরা মোটের ওপর শতাব্দীর একই পর্বের সমালোচক, তাঁদের গ্রন্থগুলিও মোটামুটি দশবছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছে। বরং কালের বিচারে ভূদেব চৌধুরীর গ্রন্থটিই বেশ কিছুটা পরে প্রকাশিত— তবুও তিনি সুকুমার সেনের মতের অনুসরণ করেছেন; আবার শচীন সেন সমালোচনাক্ষেত্রে নিজস্বতার সাক্ষ্য রেখে সমালোচনার জগতে অগ্রবর্তী হয়ে গেছেন। উপন্যাস-রচনার সূচনা পর্বে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য যে কখনোই ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না, বরং বরাবর তিনি খুঁজে ফিরেছেন মানবমনের নানা সম্বন্ধকে সেই বিষয়টিই সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; এবং ঠিক এই বিন্দু থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের উপন্যাস রচনার ধারাকে পূর্ববর্তীদের তুলনায় ভিন্ন অবস্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন।

পরবর্তীকালের সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাতের তারা দিনের রবি' গ্রন্থে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

"বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর নিহিত স্তরে যে-কথাটি ঘনীভূত ছিল, 'রাজর্ষি'-তে যে কথাটি আরো ঘন, সেটার মধ্যেই ছিল পরবর্তী সমগ্র রবীন্দ্রনাথের পূর্বাভাস। সেটা হল রাষ্ট্রনৈতিক বা ধর্মনৈতিক উগ্রতার সম্মোহকে চিনতে পারা।" (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ. ৭০)

সমালোচক জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেছেন,

"ইতিহাসের উপকরণ গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের লক্ষণীয় হয়েছে ইতিহাসের ঘটনাগত ঘাত-প্রতিঘাত নয় ততটা, পরন্তু মানুষের অন্তর্লোকের ভাবনা বেদনা। প্রথম উপন্যাস করুণাতেই এ অন্তর্মুখী প্রবণতার স্পষ্ট পরিচয় ছিল।" (ঘোষ। ১৯৯৫। পৃ.৩০)

এই ভাবনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সে নাটক 'অচলায়তন' হোক, কিংবা 'রথের রশি'; সে 'নৈবেদ্য'-র কবিতা হোক কিংবা 'বলাকা'র, সে 'ঘরে-বাইরে' হোক কিংবা 'যোগাযোগ'— রবীন্দ্র-চিন্তনে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। যে ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি,

রাজনীতি কিংবা দাম্পত্যনীতির উগ্রতা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে খণ্ডিত করে তার বিরুদ্ধাচারণ করে গেছেন লেখক বরাবর— যার সূচনাও হয়েছিলো প্রথমপর্বের উপন্যাসগুলি থেকেই।

এই উপন্যাস সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসে ছাড়াও ভূদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে। এই গ্রন্থটির বিশেষত্ব এখানেই যে প্রচলিত ধারায় উপন্যাসের কাহিনি বা চরিত্রের বিশ্লেষণ না করে সমালোচক চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির রচনাকাল ও ঘটনাকালের প্রেক্ষাপট অন্বেষণ করে তার ভিত্তিতে উপন্যাসগুলিকে বিচার করেছেন। আর এই প্রেক্ষাপট অন্বেষণ শুধুমাত্র উপন্যাসগুলির কালগত হিসেবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা তৎকালীন রবীন্দ্র-মানসের প্রতিও আলোকপাত করেছে।

> "রাজ্য ত্যাগ করে যাবার সময়ে গোবিন্দমাণিক্য গেরুয়া পরেছিলেন,— বিল্বনকে বলেছিলেন, "আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিই বাড়িতে থাকিব। আমার মানবজন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মতো নই, আমি রাজা হইয়া কী করিব?"
>
> পরবর্তী কালে রবীন্দ্র-কল্পিত 'মানুষের ধর্ম'র সাধনার পূর্বসূত্র এখানে স্পষ্ট বিমূর্ত হতে দেখি। আর এ-কথাও মানতেই হবে, এই গভীর নিবিড় জীবন-ভাবনা কখনোই শিশু-মানসিকতার উদ্দেশ্যে উৎসারিত হওয়া সম্ভব নয়।" (চৌধুরী। ২০১৬। ২৩)

আসলে এই উপন্যাস রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ যে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়ে পিতার নির্দেশে এবং সমাজের প্রয়োজনে একের পর এক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে চলেছিলেন এবং পাশাপাশি তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ক্রম উন্মেষ ঘটছিল, তারই প্রতিফলন যে এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে সেই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছিলেন সমালোচক।

৩. চোখের বালি:— রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার প্রথম যথার্থ সূত্রপাত ঘটে বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চোখের বালি'- (১৯০৩) প্রকাশের সমকালে ও অব্যবহিত পরবর্তীকালে। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পদ্ধতি ও ঘরানার সাক্ষ্য রাখতে সমর্থ হলেন। ইতিপূর্বে বঙ্কিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রোমান্স এবং ঘটনার প্রাধান্যধর্মী উপন্যাস রচনার রীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি বলেই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিরতি নিয়ে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলেন 'চোখের বালি'।

এই সেই উপন্যাস যা সমকালে এবং পরবর্তীকালে এমনকি বর্তমানকালেও যুগপৎ পাঠক ও সমালোচক মহলের মনোযোগ আকর্ষণে সফল হয় এবং একই কারণে এই উপন্যাস নিয়ে বিতর্কও হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। একদিকে যেমন দুর্নীতির অভিযোগ অন্যদিকে তেমনই প্লট নকলের অভিযোগ— এই দ্বিবিধ আক্রমণ গ্রাস করে 'চোখের বালি'-র পত্রিকা-প্রকাশের কালকে। মূলত 'সাহিত্য' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই সমালোচনার চর্চা অগ্রসর হয়েছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' গল্পের প্লটের সঙ্গে 'চোখের বালি'-র প্লটের সাযুজ্যকে মিলিয়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায় এক দীর্ঘ সমালোচনা রচনা করেন। আদিত্য ওয়হদেদার তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন;

> "এটা ঠিক যে 'উমা'-র প্লট ও প্রধান চরিত্র যথা বিনোদিনী, উমা ও যোগেশ্বর চোখের বালির মূল প্লট ও চরিত্রের মধ্যে বিনোদিনী ,আশা ও মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রায় মেলে। কিন্তু এ মিল-এর অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ 'উমা'-র নকল করেছেন। 'সাহিত্য'র অভিযোগ নিতান্তই বিভ্রান্ত, বিদ্বেষপ্রসূত। যদি ধরাও যায় যে রবীন্দ্রনাথ উমা পড়েছিলেন ও তার থেকে সজ্ঞানেই চোখের বালির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলে, তা হলেও রবীন্দ্রনাথকে ততটুকুই অভিযুক্ত করা সম্ভব যতটুকু আমরা শেকসপীয়রকে করেছি অন্যের বিষয়বস্তু থেকে তাঁর নাটকের উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য।" (ওয়হদেদার। ১৯৯৫। পৃ. ৬৭-৬৮)

যদিও বহু পরবর্তীকালের, তবু প্লট নকলের অভিযোগের ব্যাখ্যায় আদিত্য ওহদেদারের এই মন্তব্য কতটা নিরপেক্ষ তা ভিন্ন আলোচনা পরিসরের দাবি রাখে। 'চোখের বালি' প্রসঙ্গে বর্তমানে এটুকুই উল্লেখ করা সঙ্গত হবে যে সমকালে 'চোখের বালি'-র মনোবিকলন তত্ত্ব সেভাবে আদৃত হয়নি। আরো একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে পত্রিকায় প্রকাশের কালে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারাবাহিকতা ও প্রবণতার প্রতি মনোযোগ দিলে দেখব 'চোখের বালি'র সময় পর্যন্ত মূলত রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতেরই সমালোচনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোটোগল্প এবং অন্তত তিনটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়ে গেলেও রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের চর্চা সমালোচক মহলে একরকম অবহেলিতই ছিল। 'চোখের বালি'-কে ঘিরে বিদ্বেষমূলক সমালোচনা প্রকৃত নিরপেক্ষ সমালোচনার উদাহরণ হয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র উপন্যাসটি প্রকাশের বেশ কিছু সময় পরে সুখরঞ্জন রায় 'কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ' (১৩১৮ অগ্রহায়ণ) নাম দিয়ে 'প্রতিভা' পত্রিকায় যে সমালোচনাটি প্রকাশ করেন সেটিকেই রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনার সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রবন্ধে 'রাজর্ষি', 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'-র বিস্তারিত আলোচনা

করেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র সুখরঞ্জন। যদিও এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণ কারণ এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশের সময়কালের মধ্যে 'গোরা' প্রকাশিত হয়ে গেলেও, এখানে 'গোরা'র কোনো আলোচনা করা হয়নি। সুরেশচন্দ্রের অভিযোগকে ধর্তব্যের মধ্যে না রেখে নিজস্ব গতিতে সুখরঞ্জন মন্তব্য করলেন,

> "রবীন্দ্র-উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-ই নির্জলা ট্র্যাজেডি, অন্যান্য সকল গ্রন্থেই মুখ্যত রবীন্দ্রের স্বাভাবিক সুস্থচিত্ততা (Sanity of mind) ও আশাফুল্লতা (Optimism) বর্তমান। অতিভোগে 'চোখের বালি'-র আরম্ভ, অবসাদ মাধুর্যে ইহার শেষ, এইজন্য রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুসত্ত্বেও 'চোখের বালি' ট্র্যাজিডি নহে।"(রায়। ১৩৬৯। পৃ. ১৮৪-১৮৫)

পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছিলো সেই ধারাকে বজায় রেখে বলা যায় সুখরঞ্জন 'চোখের বালি'-র সমালোচনা অংশের সূচনায় পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি অর্থাৎ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', বা 'রাজর্ষি'-র উল্লেখ করেছেন 'চোখের বালি'-র প্রবণতার আমূল পরিবর্তনের পালাবদলকে ফুটিয়ে তুলতে। পরবর্তীকালেও অধিকাংশ সমালোচক এই রীতিতেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচনা করে গেছেন। পূর্ববর্তী দুই উপন্যাসে বঙ্কিমী রীতির অনুসরণ করার সমান্তরালে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে নিজস্ব সত্তা অন্বেষার প্রচেষ্টাও যে তরুণ ঔপন্যাসিকের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিলো তা আমরা দেখেছি। কাজেই এই তিনটি উপন্যাসকে নির্দিষ্টরূপে কোনো বিশেষ ধারার উত্তরসূরি হিসেবে বিচার করা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে সুখরঞ্জনের মন্তব্যের সাপেক্ষে বলা যায়, সমসাময়িককালে 'চোখের বালি' ট্র্যাজেডি কিনা তার থেকেও বেশি বড় একটি প্রশ্ন উঠেছিল এর অশ্লীলতাকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' নিয়ে সাধারণ পাঠক ও সমালোচকমহলে যে নেতিবাচকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই অনুরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয় 'চোখের বালি'-কে কেন্দ্র করেও। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঘটনার প্রাধান্য কেন্দ্রিক পদ্ধতিকে ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ যে চরিত্রদের 'আঁতের কথা' বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছিলেন সমকালীন পাঠক ও সমালোচক মহলের প্রবহমান রুচির প্রবণতা তাকে উপলব্ধি করতে পারেনি বলেই মহেন্দ্র-বিনোদিনীর অবদমিত কাম-চেতনা অশ্লীল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সুখরঞ্জন ঠিক এই দিকটিকেই সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন।

সমালোচক সুকুমার সেনের সমালোচনাগুলি যে তিনটি স্তরে বিভাজিত হয়ে আলোচিত হয়েছে সে বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রথমস্তরের উপন্যাসগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে দ্বিতীয় স্তর থেকে সুকুমার সেন প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণকালে প্রতিটি উপন্যাসেরই ঘটনা ও চরিত্রের মনোভাবের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে গেছেন। এই দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ব্যক্তি ও সমাজ সংঘর্ষ'। এই স্তরে তিনি 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' এই তিনখানি উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। যে 'চোখের বালি'-কে সকলে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলে আলোচনার প্রয়াস নেন সেই উপন্যাসেই সুকুমার সেন পেলেন আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ;

> "'চোখের বালি'-তে পাত্রপাত্রীর মনের দ্বন্দ্ব অবলম্বনে ব্যক্তিত্ত্বের প্রকাশ ও বিকাশ নিপূণভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাই ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক উপন্যাস।" (সেন। ১৩৫৩। পৃ. ৩৪৪)

উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরার বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিশেষ করে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচক। মহেন্দ্রের চরিত্রের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবই যে তাকে চিরকাল অন্যের মুখাপেক্ষি করে তুলেছিলো তার যথার্থ বিশ্লেষণকালে সুকুমার সেন দেখিয়েছেন কেন মহেন্দ্র যুবক বয়স পর্যন্ত মা-কাকিমার ছায়ায়, বিবাহের পর পত্নীতে এবং শেষে বিনোদিনীতে মত্ত হয়ে গেল।

> "...বিবাহের পর মাতার প্রভাব সে কাটাইয়া উঠিয়াছিল;...। অথচ বালিকা আশার এমন সাংসারিক জ্ঞান অথবা স্বাভাবিক বোধ ছিল না যাহাতে তাঁহার উপুর মহেন্দ্রের দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ত্ব নির্ভর করিতে পারে। সুতরাং বিনোদিনীর কর্ম্মনিপূণ ও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের আশ্রয় পাইয়া মহেন্দ্রর চিত্ত যেন কূল পাইল।" (পৃ. ৩৪৭-৩৪৮)

আধুনিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসের চরিত্রের মনোলোকের উত্থান-পতনের চিহ্ন অনুধাবন; সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সুকুমার সেনও ঘটনা-ধারার সঙ্গে যুগপৎভাবে চরিত্রের বিকাশের পথরেখার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

> "বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব উন্মেষের, দেহাত্মবোধ হইতে তার জাগরণের এই ইঙ্গিতটুকু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব।" (পৃ. ৩৪৮)

বিনোদিনীকে 'জাত-মায়াবিনী' বলে চিহ্নিত করলেও যথাক্রমে মহেন্দ্র ও বিহারীর সংস্পর্শ কী ভাবে তার দৈহিক ও মানসিক উন্মেষ ঘটালো তার উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি সমালোচকেরা উপন্যাসের সমালোচনাকালে ভিন্ন ভিন্ন রীতির প্রয়োগ করে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণরীতির প্রতি খেয়াল করলে দেখব; সুকুমার সেন এক্ষেত্রে নিজস্বতার চিহ্ন রেখেছেন রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের সঙ্গে বা অপর উপন্যাসের সঙ্গে সাযুজ্য অন্বেষণের মধ্য দিয়ে। 'চোখের বালি'-র ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। বিনোদিনীর চরিত্রের গড়নের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পের বিনোদা চরিত্রের ছায়া।

সুকুমার সেনের মতোই ভূদেব চৌধুরীও রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে সূচনাপর্বের উপন্যাসের পরবর্তী স্তরকে নামাঙ্কিত করেছেন 'বিকাশকালের উপন্যাস ও গল্প'— এবং এই পর্যায়ে রেখেছেন 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' এই তিনটি উপন্যাসকে। অর্থাৎ, 'রাজর্ষি'-র পরে ১৬ বছরের বিরতি নিয়ে 'চোখের বালি'-তে যখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী প্রভাবমুক্ততার সাক্ষ্য রাখছেন তখন থেকে ভূদেব চৌধুরী রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যের জগতকে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিকাশকাল হিসেবে। 'চোখের বালি'-র সমস্যাজটিল মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির প্রতি সমালোচকের মন্তব্য জ্যা-মুক্ত তিরের ফলার মতো সঠিক স্থানটিতে আঘাত করে;

> "নরনারীর জীবনের যৌন প্রভাবের দেহ-মনোময় রহস্য-জটিলতায় এমন সুমিত সাহসী ব্যাখ্যা এর আগে হয়নি কখনো বাংলা সাহিত্যে।" (চৌধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৪৯)

অর্থাৎ ইতিপূর্বে বা অনতিপরে যেখানে 'চোখের বালি'-র সিংহভাগ সমালোচনাতেই সমালোচকেরা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সেখানে ভূদেব চৌধুরী মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সঙ্গে যৌনতার অনুষঙ্গই যে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্কের টানাপোড়েনকে গড়ে তুলেছিল সেই দিকটির প্রতিও আলোকপাত করেছেন। এই সময়কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি এসেছে যে ভোগেই ভোগের শেষ নয় ('কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ, 'প্রাচীন সাহিত্য'), বরং স্বেচ্ছায় ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করতে পারাতেই মানুষের পূর্ণতা। ভূদেব চৌধুরীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিত থেকেই 'চোখের বালি'-তে ফ্রয়েডীয় 'Sublimation of Libido' তত্ত্বের পাঠ গ্রহণ করতে পারি। ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ভূদেব চৌধুরীর সমালোচনার যে অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল উপন্যাসে মায়ের ঈর্ষার দিকটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য।

"অনেকটা বধূর প্রতি ঈর্ষার বশেও রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের যৌবনমত্ত চিত্তের সামনে ঠেলে দিয়েছিলেন...।"(পৃ.২৫০)

'চোখের বালি'-র শেষাংশ নিয়ে তথাকথিত আধুনিক সাহিত্যগোষ্ঠীর কাছে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচিত হতে হয়েছিলো, অর্থাৎ বিনোদিনী-বিহারীর বিবাহ না দিয়ে বিনোদিনীকে কাশীবাসিনী করার সিদ্ধান্তে পরবর্তী সময়ে বুদ্ধদেব বসু সহ বহু আধুনিক সাহিত্যিক আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। এই শেষাংশ সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ না করে ভূদেব চৌধুরী পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন 'চোখের বালি'-র ঔপন্যাসিক হওয়ার পাশাপাশি একই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য'-এর কবিও; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার চরমক্ষণের সূচনা ঘটে গেছে এই একই কালপর্বে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের মনন-চিন্তন যে একান্তভাবে হিন্দুত্ববোধের দ্বারা গ্রস্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল; কাজেই ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আচার্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধিতা করে বিধবার বিবাহ দান এই কালপর্বের মানসিকতায় স্থান পায়নি। উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে যেমন অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজার উত্থানের কথা ঘোষণা করা যায়নি (প্রসঙ্গ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট') তেমনই বিধবা-বিবাহ আইন-সম্মতরূপে প্রচলিত হয়ে গেলেও সমাজে তা সহজ হয়ে ওঠেনি। কাজেই 'চোখের বালি'-র শেষটাতে যে তিনি সমাজকেই গ্রাহ্য করেছিলেন এ কথা সর্বজনবিদিত; কিন্তু সমাজের ইচ্ছেকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও 'চোখের বালি'-তে বিধবার প্রেমকে সমাজ ভালো চোখে দেখেনি। ফলে সমসাময়িককালে এই উপন্যাসের সমালোচনা হয়েছে প্রায়শই উনিশ শতকীয় সমাজে প্রচলিত ঠিক-ভুলের নিরিখে।

ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে 'চোখের বালি'-র বিনোদিনী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন,

"বিনোদিনীর চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন বাংলা উপন্যাসকে তা দ্রুত বিংশ শতকীয় আধুনিকতার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল।" (গুপ্ত। ১৩৫৮। পৃ. ১৮৪)

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের আদলে এই উপন্যাসে বিধবার প্রেমকে কেন্দ্র করে ত্রিভুজ প্রেম-কাহিনি গড়ে তুললেও বিনোদিনী চরিত্রের সৃজনের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রমও করে গেছেন।

ক্ষেত্র গুপ্তের এই মন্তব্যেরই সঙ্গত করে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য,

> "চোখের বালি' উপন্যাসের নায়িকান্ত বিবৃত সমাপ্তি ভিন্ন কথা বলে। সমাপ্তিটি নানাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার মধ্যে প্রধান হল বিনোদিনীর নিজেকে খুঁজে পাওয়া। এ উপন্যাসে সমুদয় প্রধান সিদ্ধান্ত বিনোদিনীর। সমুদয় প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বিনোদিনীর। শেষ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে বিনোদিনী। বাংলা উপন্যাসে এমন নায়িকাঘটিত সমাপ্তি এর আগে এত সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণতা পায়নি। উপন্যাসটির আধুনিকত্বের একটি বড় অভিজ্ঞান সে;— বিহারীর সংজ্ঞার্থ সন্ধানের প্রস্তাবে তার রাজি না হওয়া, বিহারীর জনহিতকর্মে তার যথাসর্বস্ব দান— বিনোদিনীর যন্ত্রণাকে উত্তীর্ণ করেছে ভিন্ন মাত্রায়। (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ. ৭৩)

কাজেই এই যে 'চোখের বালি'-র আধুনিকতা নিয়ে নানান সমালোচকেরা নানান মন্তব্য করে গেছেন সেই আধুনিকতার কেন্দ্রটি বিনোদিনীতেই স্থাপিত। আরো একটু বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়া এবং না দেওয়ার প্রশ্নের এই 'জাক্সটাপোজিশন'-এর মধ্যেই যুগপৎ 'চোখের বালি' উপন্যাসের আধুনিকতা এবং একইসঙ্গে প্রবহমান ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত জুড়ে রয়েছে। এই আধুনিকতার সংজ্ঞা আসলে সমালোচকের দৃষ্টিতেই রয়েছে। বিনোদিনী যে অধোমুখে নতচক্ষে বিহারীর বিবাহপ্রস্তাব মেনে নিল না, বরং নিজের ভবিতব্যকে নিজেই নির্বাচন করল এখানেই সে আধুনিক নারীর প্রতিভূ; এবং আগাগোড়াই সে তাই। সে নিজে যেটা মনে করেছে সেটাই সে করে গেছে। সমাজ-সংসারের কথা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী নিজের ভাবনাকে চালিত করেনি। উনিশ শতকের নারীর প্রতিভূ হিসেবে এখানেই বিনোদিনীর অসামান্যতা এবং উপন্যাসটিও ঠিক এই কারণেই আধুনিকতার শিলমোহর পেয়ে গেছে।

এইবারে উপন্যাসটির পশ্চাদপসরণের দিকটির প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। শ্রীপুলকেশ দে সরকার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' গ্রন্থে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "আঙ্গিকের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় উপন্যাসে বঙ্কিমী আমলের প্রভাব সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনীকার বহুবার কাহিনীর অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পাঠকের মুখোমুখি হয়েছেনে এবং পাঠককে সম্বোধন করেছেন। চোখের বালিতেও মহেন্দ্র আশাকে শিক্ষাদানের যে প্রচেষ্টা করেছিল সেদিকে কাহিনীকার (রবীন্দ্রনাথ) পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন; এমন গম্ভীর-প্রকৃতি শ্রদ্ধেয় মূঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপন কার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইন্সপেক্টর তাহার

অনুমোদন করিবেন না। পরিষ্কার বোঝা যায় সেকালে রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ পাঠকেরা বিষবৃক্ষের নতুন রস সম্ভোগে মাতাল এবং এ রস তাঁদের চিন্তাধারায় মিশ্রিত হয়েছে, এই জাতীয় প্রশ্নের দোলায় তাঁরা দুলছেন।" (সরকার দে। ১৩৬৮। পৃ. ৩৪-৩৫)

এই একই বৈশিষ্ট্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজে পেয়েছেন 'করুণা'-র আলোচনাকালে। তাঁর প্রবন্ধটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন,

"...এই কাহিনীতে অন্তত দশ বার লেখকের দ্বিতীয় সত্তা বা সেকেণ্ড সেলফের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ...সচেতনভাবে কাহিনীমধ্যে লেখকীয় মন্তব্য প্রায়ই উচ্চারিত হয়েছে। কতকাংশে তা বঙ্কিমীরীতির অনুবর্তন।" (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ. ৬৯)

এই দুই সমালোচকের মন্তব্যের সাপেক্ষেই স্থাপন করা যায় সমালোচক জ্যোতির্ময় ঘোষের মন্তব্যকে যা তাঁর 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে,

"...চোখের বালিতে, তদানীন্তন প্রচলিত উপন্যাসের ধরনে 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ' নেই তা' নয়, যদিও বিশ্লেষণ করে 'আঁতের কথা বের করে দেখানো'র চেষ্টোা লক্ষণীয়। এবং, এ চেষ্টাও চোখের বালিতেই যে প্রথম হলো, তা-ও বলা পুরোপুরি সঙ্গত হয় না। কারণ, চেষ্টা তো প্রথমাবধি অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই চলছিল। সেইজন্য, চোখের বালিকে, 'আকস্মিক' বললে পুরোপুরি ঠিক বলা হবে না। তাহলে প্রশ্ন, চোখের বালির বিশেষত্ব কী? তা কি নেই? উত্তর: চোখের বালিতে যদিও 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া' থেকে রবীন্দ্রনাথ নিবৃত্ত হতে পারেন নি এবং 'আঁতের কথা বের করে দেখানো'র প্রকৃত অর্থে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলতে যা বুঝি, চোখের বালি ঠিক তা-ও নয়, তবু, আপেক্ষিক বিচারে চোখের বালিতে 'ঘটনাবাহুল্য' কমে এসেছে এবং 'আঁতের কথা বের করে দেখানো'র প্রতি লেখকের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যরূপে বর্ধিত হয়েছে, একথা বলতেই হবে।" (ঘোষ। ১৯৯৫। পৃ.৩৫)

এই তিন সমালোচকের মন্তব্য থেকেই অথবা উপন্যাসটির সরাসরি পাঠেও আমরা বুঝি বঙ্কিমীরীতির 'আইকনিক' ত্রিকোণ প্রেম, বিধবার প্রেম এবং যৌনতা, চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক-জটিলতার নানান বহিঃপ্রকাশ এবং পাঠকের সঙ্গে কথকের সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপনের কৌশল এসবই ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থান পেয়েছিল। পাশাপাশি স্মরণে রাখতে হয় উপন্যাসটির ভূমিকাকে, যা রবীন্দ্রনাথ লিখছেন উপন্যাস প্রকাশের প্রায় বছর চল্লিশেক পরে। কিন্তু এই চল্লিশ বছর পরে লেখা ভূমিকাতেও যে প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উঠে এসেছে তা হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এর অনুষঙ্গ। কাজেই এই 'চোখের বালি' একই সঙ্গে 'বিষবৃক্ষ'-এর নবনির্মাণ এবং বঙ্কিমের অনুসরণও বটে। বঙ্কিমী উপন্যাসে বহুল ব্যবহৃত অলৌকিকতা, দৈব সহায়ের মতো বিষয়গুলিকে পেছনে ফেলে আসার পাশাপাশি বিধবা নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের

মনোভাব যা বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে, তার যৌনতাকে ‘পাপাচার’-এর পরিবর্তে প্রবৃত্তি হিসেবে স্বীকার করেই তাকে নিবৃত্ত করে বিনোদিনী চরিত্রকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত করার জিজ্ঞাসা থেকেই গড়ে উঠেছে ‘বিষবৃক্ষ’-এর নবনির্মাণ।

এই নবনির্মাণের দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন অধ্যাপক অর্চনা মজুমদার তাঁর ‘রবীন্দ্র-উপন্যাস-পরিক্রমা’ গ্রন্থে। ‘বিষবৃক্ষ’ এবং ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর সঙ্গে ‘চোখের বালি’-র মিল-অমিলের চিহ্ন অন্বেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক মজুমদার মন্তব্য করেছেন,

> “সমস্ত সংসারটাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েও বিনোদিনী যে নিজেকে রক্ষা করতে পারলে এবং মহেন্দ্রের মোহ চূর্ণ করে তাকে তাঁর নিজের সংসারে ফিরিয়ে দিলে সেও বিহারীর প্রতি তার (বিনোদিনীর) প্রগাঢ় প্রেম ও গভীর শ্রদ্ধার জন্যে। চোখের বালির সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের উইল-এর মিল শুধু এই দিক দিয়েই যে, মহেন্দ্র ও গোবিন্দলাল উভয়েই কতকটা সমান অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু বিনোদিনীর সঙ্গে রোহিণীর তুলনাই চলে না। রোহিণী কামনাসর্বস্ব অতি সাধারণ নারী। রূপের তৃষ্ণা আর অচরিতার্থ বাসনাই তাকে গোবিন্দলালের দিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু বিনোদিনী রবীন্দ্রনাথের অসামান্য সৃষ্টি। তার অন্তরে অসাধারণ শক্তি ও সংযম রয়েছে, এবং তার চরিত্রের অতুলনীয় মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে সেইখানেই, যেখানে বিহারীর বিবাহের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করলে।” (মজুমদার। ২০১৭। পৃ. ৪১)

অর্চনা মজুমদারের মন্তব্যের সাপেক্ষে আবারও বলতে হয়, এই উপন্যাসটি যে যে কারণে ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর কাঠামোকে গ্রহণ করেও তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান রাখতে সমর্থ হইয়েছে তার অন্যতম হল বিনোদিনী চরিত্রের সৃজন। বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ব এবং তার নিজস্বতাই উপন্যাসটিকে পূর্ববর্তী উপন্যাসের থেকে পৃথক করে তোলে, করে তোলে আধুনিক।

মনোরঞ্জন জানা তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)’ গ্রন্থে ‘চোখের বালি’ উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> “বিনোদিনী বিবাহে সম্মতি দান করিতে পারে নাই তাহার অত্যাজ্য সতীধর্ম্মের (স্বামী সম্পর্কে হিন্দু পৌরাণিক বোধ) কথা স্মরণ করিয়া নয় (তাহা হইলে পরজন্মে বিহারীকে স্বামীরূপে লাভ করিবার জন্য বিনোদিনীর ইহজন্মে তপস্যার কথা উঠিত না) বিনোদিনী সম্মত হইতে পারে নাই জীবনে অমোঘ বিচার বোধের কথা স্মরণ করিয়া। ইহাই মানবভাগ্য বা নিয়তি। মহেন্দ্র সম্পর্কে সে যে ভুল করিয়াছে, সেই ভুল তাহার বিবাহিত জীবনে বারংবার স্মৃতির ছায়া জাগাইয়া তাঁহাকে উদ্ভ্রান্ত বিনিদ্র করিয়া তুলিবেই। আর তাহার এই ভুল ঘটিয়াছে বিহারীর দুই

চক্ষুর সম্মুখে। বিহারীর দাম্পত্য প্রেমেও কি বারংবার সেই স্মৃতির ছায়াপাত ঘটিয়া যাইবে না?" (জানা। ১৯৬০। পৃ. ২৮)

'চোখের বালি'-র সমাপ্তি নিয়ে পরবর্তীকালের বহু বিদগ্ধ সমালোচক যে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেও যে উপন্যাসের সমাপ্তিটা নিয়ে একটা আক্ষেপ থেকে গেছিল তা আমরা জানি। কিন্তু একটি সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরে সমালোচক এবং পাঠক সাহিত্যকর্মটির পুনঃপাঠের মাধ্যমে নিজের মতো করে নতুন নতুন পাঠ নির্মাণ করে চলেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও 'চোখের বালি'-র সমাপ্তিতে বুদ্ধদেব বসু-উক্ত 'মনোরঞ্জনীর প্রলেপে'র অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু সমালোচক মনোরঞ্জন জানার নিজস্ব পাঠ উপন্যাসের সমাপ্তির মধ্যে অন্বেষণ করেছে জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ। একথা ঠিক, বিহারী যতই সংযত প্রকৃতির হোক না কেন স্বাভাবিক মানুষ হওয়ার সুবাদে বিনোদিনীর অতীত তাদের দাম্পত্যে প্রভাব ফেলত, এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা চলে না। কাজেই অধিকাংশ সমালোচক যেখানে উপন্যাসের সমাপ্তি নিয়ে দ্বিধা, হতাশা প্রকাশ করে গেছেন সেখানে সমালোচক জানা এই সমাপ্তি নির্মাণের সম্ভাব্য মনস্তাত্ত্বিক কারণের প্রতি আলোকপাত করে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন।

৪. নৌকাডুবি:— 'চোখের বালি'-তে 'মনের কারখানা ঘরে' উঁকি দেওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে ১৯০৬ সালে প্রকাশ পাওয়া 'নৌকাডুবি'-তে রবীন্দ্রনাথ আবার কেন বঙ্কিমী-ধারার ঘটনা নির্ভর উপন্যাস রচনার প্রবণতায় ফিরে গেলেন তা নিয়ে পরবর্তীকালে পাঠক এবং সমালোচক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। উপন্যাসটি প্রকাশের বছর খানেকের মধ্যে নিশিকান্ত সেন একটি সমালোচনা করেন যেখানে চরিত্র ও কাহিনির সরল স্বাভাবিক একরৈখিক বিশ্লেষণেই ইতি ঘটেছে।

চোখের বালি'-র প্রশংসিত জটিল আবর্তের প্লটের পর 'নৌকাডুবি'-র খামখেয়ালি প্লট উপন্যাসটির পত্রিকায় প্রকাশের কালে কিংবা পরবর্তীকালে, কখনোই সমালোচকদের প্রশংসা পায়নি। 'চোখের বালি'-র সংহত সজ্জার পটভূমিকার পরে 'নৌকাডুবি'-র অস্বচ্ছ, অপূর্ণ ও অসংযত প্লটের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমালোচক সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,

"চোখের বালির কাহিনী যেমন উপন্যাস রচনার পূর্ব্বেই লেখকের মনে সমগ্রতা পাইয়াছিল, নৌকাডুবির তেমন একেবারে অখণ্ড রূপ পায় নাই, লিখিতে লিখিতে কাহিনীটি পরিণামের

দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই প্রধান ভূমিকা দুইটি- রমেশ ও হেমনলিনী- কিয়ৎ পরিমাণে অপরিণত ও উপেক্ষিত রহিয়া গিয়াছে।" (সেন। ১৩৫৩। পৃ.৩৬৪)

সুকুমার সেনের সমালোচনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে সমালোচিত উপন্যাসের সঙ্গে কোনো ছোটোগল্প অথবা অপর কোনো উপন্যাসের মিল খুঁজে ফেরার প্রচেষ্টার মধ্যে। এই একই রীতির অনুসরণ করা হয়েছে এক্ষেত্রেও। উপন্যাসের ঘটনাধারার বর্ণনা, চরিত্রের বিকাশ ও মানসিক দ্বন্দ্বের জায়গাগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি 'চোখের বালি'-র সঙ্গে পারস্পরিক প্রতি তুলনা করেছেন তিনি। পাশাপাশি এই উপন্যাসেই তিনি খুঁজেছেন পরবর্তী উপন্যাস 'গোরা'-র পূর্বাভাস। এক উপন্যাসের মধ্যে পরবর্তীকালের উপন্যাসের বীজ অন্বেষণের এই প্রচেষ্টা যদিও নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি 'করুণা'-র মধ্যেই 'চোখের বালি'-র পূর্বাভাস খুঁজে নেবার একটা প্রয়াস সমালোচক মহলে প্রচলিত ছিল কিংবা উদয়াদিত্য চরিত্রের মধ্যে পরবর্তীকালের নিখিলেশ কিংবা বিপ্রদাস চরিত্রের বীজ অন্বেষণের একটা চেষ্টা— কাজেই এই ধারাটা অব্যাহত; এবং রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির পূর্বাপর সাদৃশ্য খোঁজার এই ঐতিহ্য আসলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যেই বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতের পরিচয় নিতে গেলেও দেখব অপরিণত মনে লেখা সূচনাকালের কাব্যের মধ্যে মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে না উঠলেও পরবর্তীকালের কাব্যজগৎ কিংবা নাট্যজগতে পূর্বে অঙ্কুরিত হয়ে থাকা নানা ভাবনা বিকাশ লাভ করেছে।

'নৌকাডুবি'-র প্রতি অন্যান্য সমালোচকদের যা অভিযোগ তাকেই স্বীকার করে নিয়ে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী যেখানে স্বতন্ত্র হলেন তা হল এই উপন্যাসের দুর্বলতার কারণ অন্বেষণ। অন্যান্য অধিকাংশ সমালোচকেরা যেখানে এই উপন্যাসের দুর্বলতার জায়গাগুলি চিহ্নিত করে গেছেন সেখানে সমালোচক চৌধুরী আরো গভীরে গিয়ে তার বাস্তবসম্মত অনুসন্ধানী দৃষ্টির প্রসার ঘটিয়ে দেখালেন;

"... নৌকাডুবির সমস্যা মোটেও রোমান্টিক নয়, একান্তভাবে নরনারীর যৌন জীবনের জটিল সমস্যা। দীর্ঘ তিন মাস একত্র স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করার পরে দুটি যুবক-যুবতীর আত্মমোক্ষণের সমস্যা কেবল মনের দিক থেকেই আসে না, তার দেহগত জটিলতাও অনস্বীকার্য। যে মুহূর্তে গল্পটি সেই সমস্যাকেন্দ্রকে পরিহার করে গেছে, তখনই উপন্যাস ধর্মের পলায়নবৃত্তি হয়েছে স্পষ্ট।" (চৌধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৫১)

এই একই স্বরের অনুরণন শুনি মনোরঞ্জন জানার সমালোচনা কর্মে যা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)' গ্রন্থে একটি কঠিন প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে স্থান লাভ করেছে,

> "... যদি রমেশের ভুল আরো কিছু পরে ভাঙ্গিত, ইতিমধ্যে কমলার অপরিণত দেহ-মন রমেশের স্নেহ-ধারায় ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিত এবং সেই প্রেম পূজায় কমলা যদি তাহার সমগ্র সত্তাকে অর্ঘ্যস্বরূপে উৎসর্গ করিয়া দিত, তখন কমলা সতীত্বের সংস্কারবোধ দ্বারা নারী জীবনের অমন বন্ধনকেও কাটাইয়া উঠিতে, অমন গ্লানিকেও জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইত কি না— এবং এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া নারী হৃদয়ের চিরন্তন কোন রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত কি না।" (জানা। ১৯৬০। পৃ. ৬৫)

একই ভাবে উল্লেখ করা চলে সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (প্রবন্ধ সংকলন) কিংবা জ্যোতির্ময় ঘোষের 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের মন্তব্যগুলিকেও,

> "নৌকাডুবি'-তে... ভয়ঙ্কর রকম বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেও প্রায় অমানুষিক শক্তিবলে নারীর শুচিতা রক্ষা করে এবং হিন্দুবিবাহের অলৌকিক মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্য প্রমাণ করে সনাতনীদের সন্তোষ বিধান করেছেন।" (দত্ত। ১৯৫৯। পৃ. ৬৫)

সমালোচক জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> "...চার দশকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে, প্রথম চার দশক ধরেই প্রায়শ, বুঝেছেন কি রবীন্দ্রনাথ, সাইকলজির দিকটাতেও অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ নিরাসক্ত নিরীক্ষক হয়ে উঠতে পারেন নি। বিজ্ঞানের, মনোবিজ্ঞানেরও মূল কথা যে—'অবজারভেশন' ও 'এক্সপেরিমেন্ট', সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য চরম দুঃসাহসিক ঝুঁকি নেওয়ার মতো আধুনিক এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। 'নৌকাডুবি'র রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যসংস্কারের দুর্গে তাৎক্ষণিক ভাবে হলেও বন্দী। ধরা যাক, কমলার সঠিক পরিচয় জানার আগেই, বিবাহিতা-স্ত্রী জেনেই রমেশ যদি কমলার সঙ্গে সুস্থ, স্বাভাবিক ও পূর্ণাঙ্গ যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতো— তাই ছিল স্বাভাবিক— এবং ধরা যাক, কমলা যদি সেই যৌনমিলন থেকে মাতৃত্বে পৌঁছত— এবং ধরা যাক তখন যদি কমলা এবং রমেশ দুজনেই জানতে পারতো, রমেশ নয়, নলিনাক্ষই কমলার স্বামী, আর নলিনাক্ষও জানতে পারতো সব কথা : কী পরিণাম হতে পারতো প্রধান তিনটি চরিত্রের অর্থাৎ তাদের মনের ছবিটা কী অদ্ভুত জটিল ও অবিশ্বাস্য গভীর তীব্র যন্ত্রণার্ত হয়ে উঠতো।" (ঘোষ। ১৯৯৫। পৃ.৩৯)

উক্ত প্রত্যেক সমালোচকদের মূলের কথাটা আসলে একই যা তুলনামূলকভাবে মনোরঞ্জন জানা ও জ্যোতির্ময় ঘোষের মন্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই মূলের কথাটি কী? না

রমেশ-কমলার তিন মাসের দাম্পত্য এবং তার পরেও বেশ কয়েকমাস একত্রবাসের পরেও সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে না ওঠা, যার ফলে উপন্যাসটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের অনুকূলে বেশ কিছু পরিস্থিতি উপন্যাসের মধ্যে থাকলেও তাদের এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস উপন্যাসে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে নারী মনস্তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করবেন বলে যে ভেবেছিলেন তা তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার দ্বিধাবশতই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ফলে, উপন্যাসটি একেবারেই বাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে পারেনি, সম্পূর্ণত ব্যর্থ হয়ে গেছে। কাজেই যে মনোভাব থেকে, যে সামাজিক দ্বিধার জায়গা থেকে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীর বিবাহ দিতে পারেননি সেই একই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জায়গা থেকেই কমলা-রমেশের যৌনসম্বন্ধের স্বাভাবিকতাকে এড়িয়ে গেছেন। কার্যত ‘পরপুরুষে’র সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন করাতে পারলে সেই যুগে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যে একইসঙ্গে সামাজিক ও সাহিত্যিক বিপ্লব ঘটাতে পারতেন তা কল্পনা করে নিলেও বাস্তবে এমনটা ঘটেনি। সমস্যার স্বাভাবিকতা ও জটিলতা এড়িয়ে গেছেন বলেই উপন্যাসটিও সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। এই কারণগুলিই যে উপন্যাসের ‘লজিক’-কে লঙ্ঘন করে যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও উপন্যাসটিকে ব্যর্থ করে তুলেছে তার ইঙ্গিত রয়েছে সমালোচক পুলকেশ দে সরকারের সমালোচনা কর্মেও।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা’-র দ্বিতীয় খন্ডে এই উপন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন,

> “চরিত্রসহাবস্থানবর্জিত উপন্যাসের এই অন্ত্যপর্ব নামতঃ উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হইলেও, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর জীবনকাহিনীসংসক্ত হইলেও, বস্তুতঃ এক দায়িত্বহীন রূপকথারাজ্যের অংশবিশেষ। সেখানে ব্যক্তিসত্তা কাহিনী বিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত নয়, সেখানে ঘটনার গতিবেগ ব্যক্তির অন্তর্জগত হইতে কোন শক্তি আহরণ করে না, সেখানে উপন্যাস বাস্তবরীতিপ্রধান হইলেও দৈবসংঘটনের আকস্মিকতাগ্রস্ত গল্প মাত্র।” (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৬। পৃ.২৯৪)

সমালোচক যে ‘দায়িত্বহীন রূপকথারাজ্যের অংশ’ হিসেবে এই উপন্যাসটিকে চিহ্নিত করেছেন তার অন্যতম প্রধান কারণ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, এবং অপর কারণটি রয়েছে নলিনাক্ষের সঙ্গে কমলার সাক্ষাৎ এবং মিলন প্রসঙ্গের মধ্যে। এই বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ করলে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ‘ইন্দিরা’-র ছায়া লক্ষ করতে পারব। সেখানেও যেমন

প্রায় অদ্ভুত দৈব যোগে ইন্দিরার সঙ্গে তার স্বামীর পুনর্মিলন হয়েছে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ কতকাংশে সেই রীতিরই অনুবর্তন করেছেন। ফলে উপন্যাস দেহে আকস্মিকতার ব্যবহারকে উনিশ শতকে প্রথমবারের জন্য উপন্যাস পাঠে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা বাঙালি পাঠকের মন যেভাবে মেনে নিয়েছিল সেই আকস্মিকতা এবং অসম্ভবতার যুগ্ম প্রয়োগ বিশ শতকের দীক্ষিত পাঠক এবং সমালোচকের মন যে সেই একই সহজতায় মেনে নেবে না তা বলা বাহুল্য।

একদিকে যেখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অধিকাংশ সমালোচক 'নৌকাডুবি'-র ত্রুটিগুলির বিচার-বিশ্লেষণে রত ছিলেন সেখানে ক্ষেত্র গুপ্ত 'নৌকাডুবি'-কে 'চোখের বালি'-র পরের দুর্বল ও অসফল উপন্যাস হিসেবে বিচার না করে এই উপন্যাসটিকে দেখেছেন 'চোখের বালি'-র সমস্যা জটিল মনস্তত্ত্বসম্বলিত গম্ভীর ওঠা-পড়া বা বলা ভালো টানাপোড়েন যুক্ত প্লট বুননের পর ক্লান্তি অপনোদনের আয়ুধ হিসেবে। একইভাবে অধ্যাপক মেহবুবুল আলম তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসের গ্রন্থে 'নৌকাডুবি'-তেও দেখেছেন 'চোখের বালি'-র সমধর্মী বাস্তবতার আখ্যানকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনোযোগ হয়তো ছিল হেমনলিনী আর কমলার মধ্যবর্তী রমেশের মানসিক টানাপোড়েনের প্রতি; যার প্রেক্ষিতে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনী ২'-তে 'নৌকাডুবি' উপন্যাস নিয়ে আলোচনাকালে উল্লেখ করেছেন,

> "রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রেমতত্ত্বে 'দুই নারী' একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা; তাঁহার বাল্যরচনার আদিম অবস্থা হইতে বার্ধক্যের পরম পরিণত অবস্থা পর্যন্ত 'দুই নারী' তত্ত্ব কিভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার সম্যক আলোচনার ক্ষেত্র রহিয়াছে। মহেন্দ্রের 'দুই চন্দ্রসেবিত গ্রহের' অবস্থা হইতে অমিত রায়ের লাবণ্য-কেতকীর সঙ্গ ও আনন্দলাভের ইচ্ছা— এই দুই নারী প্রেমতত্ত্বকেই ব্যাখ্যা করিয়াছে। ...রমেশেরও মনেও কমলা ও হেমনলিনী উভয়কে যুগপৎ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা যে জাগে নাই তাহা নহে।" (মুখোপাধ্যায়। ১৩৬৮। পৃ. ৭২)

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত 'রাতের তারা দিনের রবি' গ্রন্থে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন,

> "দুটি কারণে 'নৌকাডুবি' বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত। এক— এই প্রথম একটি উপন্যাস লিখিত হল যা ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস প্যাটার্নের বাইরে এসেছে। এ সর্বার্থে 'অনুনবিংশ'— 'চোখের বালি'তেও মহেন্দ্র আশা বিনোদিনী স্মরণ করিয়ে

> দেবেই সুবিখ্যাত বঙ্কিমী ত্রিভুজ। 'চোখের বালি' প্রতি পদক্ষেপে যেন বলে দিচ্ছে সে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-কে সংশোধন করে চলেছে। 'নৌকাডুবি' তা নয়। বিধবা নায়িকার কোনো দরকার এখানে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেননি। ... দুই—এক দায়িত্ববোধ যা রমেশের উপর চেপে বসেছে (সিন্দবাদের তুলনা দিয়েছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) তা নতুনকালের মধ্যবিত্তের অর্জিত দায়িত্ববোধ। ...'নৌকাডুবি'-ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সেই উপন্যাস, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর জের সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও এ অনন্যতার তালিকা নির্মাণে তার কথাই প্রথম উঠবে। তাই 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি'-র পরবর্তী রচনা।" (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ. ৭৪)

এই একটি মাত্র সমালোচনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানা থেকে 'নৌকাডুবি'-র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক সমালোচকই 'নৌকাডুবি'-র মধ্যে পশ্চাদপসরণ এবং দুর্বলতাগুলির প্রতিই আলোকপাত করে গেছেন; কিন্তু সমালোচক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিশ্লেষণ করে দেখালেন কালগত দিক থেকে এবং রচনাক্রমের দিক থেকে বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও কেন 'নৌকাডুবি' 'চোখের বালি'-র পরবর্তী উপন্যাস। তাঁর এই বিশ্লেষণ 'নৌকাডুবি'-র সমালোচনার জগতে অনন্য।

যেখানে অধিকাংশ সমালোচক উপন্যাসটির দুর্বলতা এবং উপন্যাসের মধ্যে থাকা তার কারণগুলিকে নির্দেশ করে গেছেন সেখানে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী তার 'রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে এই অনুসন্ধান করলেন উপন্যাসটির সমকালীনতার প্রেক্ষিত থেকে,

> "... "নৌকাডুবি" উপন্যাস দেশকাল-ব্যক্তিত্বের বাঁধনছুট মনগড়া কাহিনীর মালা,— বাইরের ঘটনার ধাক্কায় ঠেলে এগিয়েছে; অন্তর্নিহিত গল্পকাল কিংবা রচনাকালের বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটির সঙ্গে আখ্যায়িকার যোগ ঘটে নি। সব মিলিয়ে তাই এ-লেখার উপন্যাসগুণ 'বৃন্তহীন পুষ্প'র মতোই অমূলধন হয়ে আছে। তাহলেও, সমকালীন কবিচিত্তের ব্যক্তিক আর্তি তাঁর জীবন-ভাবনাকে যেমন অন্তর্বদ্ধতার বাঁধনমুক্ত হতে দেয় নি, তেমনি ঐ 'ব্যক্তি-বেদনা'র প্রচ্ছন্ন নির্যাসটুকু গল্পের অংশবিশেষে 'অবাস্তব-মনোহারিতা'র সুরভি সঞ্চার করেছিল। ঔপন্যাসিক সামর্থ্যে দুর্বল রচনাটি ঐ সূত্রে এক স্বতন্ত্র কাব্যক্ত মাত্রা আয়ত্ত করেছে; কবিও সম্ভবত এই একমাত্র দাবি উপস্থিত করতে চেয়েছেন "নৌকাডুবি"র 'সূচনা'য়।" (চৌধুরী। ২০১৬। পৃ. ৪২)

৫. গোরা:— 'চোখের বালি'-র পরে যে উপন্যাসখানি পাঠক ও সমালোচকমহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল তা অবশ্যই উপন্যাস 'গোরা'। একদিকে যখন 'সাহিত্যে'-র পৃষ্ঠায় এর সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তখন সমকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'গোরা'-র একটি প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করেন 'বাণী' পত্রিকার **১৩১৭** বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব ইতিপূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে যে দুই অভিযোগ আনেন তা অস্পষ্টতা ও দুর্নীতিজনিত; এই দুইয়ের কোনোটির দ্বারাই 'গোরা'-কে আক্রমণ করা চলে না, কারণ এই উপন্যাসের মধ্যে কাহিনি-প্রিয় পাঠকমহল আগাগোড়া কাহিনির একটা পারম্পর্য পেয়েছে, অনেকেই যার অভাব মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস 'চোখের বালি'-তে অনুভব করেছিলেন। যদিও এই অস্পষ্টতারই অভিযোগ এনেছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য'-এর পাতায় এবং 'গোরা' সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই সমালোচক মন্তব্য করেন;

> "রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসেও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন- ভারতবর্ষের ধর্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। এবং এই ধর্মতন্ত্র ও অন্য বিবিধ তন্ত্রের উপদ্রবে 'গোরা' উপন্যাসের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে।" (সমাজপতি। ১৯৯৫। পৃ. ৮৫)

কাজেই সম্পূর্ণ উপন্যাস পাঠের অবকাশের পূর্বেই যে সমালোচনা রচনা হয় তা যে কোনোভাবেই সম্পূর্ণতার দাবি রাখতে পারে না, তা একদেশদর্শীতা দোষে দুষ্ট হয় একথার উল্লেখ অনস্বীকার্য।

আমরা আলোকপাত করতে পারি দ্বিজেন্দ্রলালের দীর্ঘ সমালোচনার প্রতি,

> "...এত সুন্দর সামাজিক উপন্যাস কদাচিৎ নয়নগোচর হয়। ব্রাহ্মসমাজের সৌন্দর্য ও কদর্যতা এক সঙ্গে আর কোন উপন্যাসে দেখি নাই। জ্ঞান ও প্রেম, যুক্তি ও অনুভূতি, সহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহ এ অপূর্ব উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। ... ইহা শুধু উপন্যাস নহে। ইহা ধর্মগ্রন্থ। ... এ উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব..." (রায়। ১৩৬৯। পৃ. ২১৫)

'গোরা'-র মূল উপাখ্যান থেকে প্রতিটি চরিত্রের পৃথকভাবে বিশ্লেষণ ও শেষ পর্যায়ে এই বৃহদাকার উপন্যাস সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্তব্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ জীবিতাবস্থায় যখন তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতাগুলি প্রকাশ করছিলেন তখন সমান্তরালভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলিতেও রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনা চলছিল নানা অভিযোগের ভিত্তিতে এবং তারই নিক্তিতেই তাঁর সাহিত্য-কর্মের মূল্যায়ন চলছিল। এভাবেই

রবীন্দ্র-সমালোচনার জগতে নতুন সংযোজন বিপিনচন্দ্র পালের সমালোচনা যা গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অভাবের অভিযোগকে কেন্দ্র করে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'চরিত্র চিত্র রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিপিন পাল বিশ্লেষণ করে দেখান রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক বৈভব এবং ঐতিহ্য তাঁর সাহিত্য চিন্তার ক্ষেত্রে একইভাবে দুর্বলতা ও বস্তুতন্ত্রতার অভাবের কারণ হয়ে উঠেছে। বিপিন পালের মতে যদিও রবীন্দ্রনাথ জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন শিলাইদহ-পতিসর প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করে গ্রামীন জীবনের সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছিলেন তবুও তা ছিল জমিদারের দৃষ্টি। জমিদারতন্ত্রের আসনে বসে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গ্রামবাংলার ঘরের ভেতরের জীবন আর তার ভাষা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র বর্ণনা করেছেন 'গোরা' উপন্যাসে সেখানে রবীন্দ্রসাহিত্য বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে বলে মনে করেছেন বিপিন পাল। তাঁর এ মন্তব্যের প্রসঙ্গেই 'গোরা' উপন্যাসের হারানবাবু চরিত্র গঠনের নিপুণতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে একমাত্র হারানবাবু চরিত্রটিকে সমালোচক বিপিনচন্দ্র বাস্তবসম্মত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুতপক্ষে এই সময়ে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনাকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকা ও সমালোচকগোষ্ঠীও দুই যুযুধানপক্ষে বিভক্ত হয়ে যায়; এঁদের মধ্যে একদল রবীন্দ্রানুসারী এবং অন্যদল ছিল রবীন্দ্র-বিরোধী। পত্র-পত্রিকাকেন্দ্রিক রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচনা বা সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারাকে বুঝতে হলে এই পক্ষ-বিপক্ষ তর্কের প্রসঙ্গও কিছু পরিমাণে উল্লেখে বাধ্য হতে হয়।

এবারে আসা যাক বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির সমালোচনার ধরন নির্ণয় প্রসঙ্গে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'-র দ্বিতীয় খন্ডে এই উপন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন,

> "গোরা জাতীয় জীবনের সেই সন্ধিক্ষণের প্রতিনিধি, যখন যুবশক্তি রাজনৈতিক জাগরণের অপেক্ষা ধর্মসংস্কারের মধ্যেই দেশের মুক্তির সূত্র খুঁজিয়াছে। মনে হয়, তাহার মানসদিগন্ত বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রভৃতি প্রথম যুগের দেশনেতৃবৃন্দের ভাবাদর্শসীমিত। গোরার মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম দেশের প্রাচীন সামাজিক প্রথা ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট রীতিনীতির প্রতি পাশ্চাত্যদীক্ষিত সংশয়বাদীদের নির্বিচার শ্রদ্ধার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একান্তভাবে ও দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির সহিত নিয়োজিত, পরবর্তী উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'-তে তাহাই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠামোহের দ্বারা বিকৃত হইয়া শাশ্বত ধর্মনীতিকে কলুষিত স্বাজাত্যবোধের নিকট অবহেলায় বিসর্জন দিয়াছে।" (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৬। পৃ. ৩০২)

ভারতবর্ষের উনিশ শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব ভারতবর্ষে এমন একটা সময় এসেছিল যখন 'হিন্দুত্ব' ও 'ভারতীয়ত্ব'কে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা ও বোঝা হত। এইকালের মধ্যেই আয়োজিত হয়েছিল 'হিন্দুমেলা' যার ফলস্বরূপ পাই বালক-রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। এই কালের রেশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এসে পৌঁছোয়, যার জের চলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বকাল পর্যন্ত। এই হিন্দুত্বের ঘেরাটোপে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাঁধা পড়ে যাওয়া রবীন্দ্র-মনন থেকে 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি'-র মতো উপন্যাসের পরিণতি ও কাহিনি-বিন্যাস হিন্দু-সমাজে আত্মসমর্পণের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। পাশাপাশি এই নব-হিন্দুত্ববাদকে পুষ্ট করতে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এই দুই মহান ব্যক্তিত্বই সমানতালে সহযোগিতা করে গেছিলেন। কিন্তু 'গোরা'র রচনা ও প্রকাশ দুইই হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে। আমরা জানি কবির এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ ও তা থেকে বেরিয়ে আসার নানা কারণ নানা সমালোচক নানানভাবে বিশ্লেষণ করে গেছেন। সেসব প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচনার অবকাশ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'গোরা' লিখছেন তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল অতিক্রান্ত, তখন তিনি উপলব্ধি করে ফেলেছেন দেশটা শুধু হিন্দুদের নয়, মুসলমানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়েরও। কাজেই 'গোরা'-তে যুগপৎ হিন্দুত্বের কাল এবং তার থেকে উত্তরণের পরের মানসিকতা দুইই স্থান পেয়েছে গোরার চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের মধ্যে এই সত্যটিই রয়ে গেছে।

সুকুমার সেন রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলিকে যে তিনস্তরে বিভক্ত করে সমালোচনার প্রয়াস করেছেন তার তৃতীয় স্তরে রেখেছেন 'গোরা' থেকে শুরু করে একদম শেষের উপন্যাসগুলিকে। 'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য সম্পূর্ণ ও সংযত,

> "গোরায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্ম্মের, এবং ধর্ম্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়ের বিরাট চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ..."সমসাময়িক 'তপোবন প্রবন্ধ' এই হিসাবে গোরার আংশিক ভাষ্য। এই দুইটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রচনার মর্ম্মকথা একই,-'ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে।" (সেন। ১৩৫৩। পৃ.৩৭৬-৭৭)

সমালোচক প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনাধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিস্তারিত পাঠের মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন প্রায় একই সময়ে লেখা প্রবন্ধ 'তপোবন'-এ গোরার অনুভূমিক

ভাষ্য। সমকালের রবীন্দ্রজীবনপঞ্জির প্রতি খেয়াল করলে দেখব ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে যে হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার মোহ কেটেছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকেই, যার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়ে গেছে; এবং 'গোরা'-র রচনাকাল পর্যন্ত এসে সে মোহের ছাপ রবীন্দ্রনাথের মনন এবং চিন্তন থেকে বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হয়েছিলো। 'গোরা'-তে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তার সম-মনোভাবের প্রকাশ দেখি এই 'তপোবন' প্রবন্ধে। সমগ্র উপন্যাসের সমান্তরালে তিনি আলোচনা করে গেছেন তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজের নানাদিক নিয়ে, যার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে 'গোরা'-র পাতায় পাতায়, কাজেই এই সমান্তরাল আলোচনা যথোপযুক্ত। এই উপন্যাসের আলোচনায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল গোরার চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের ছায়া লক্ষ করা। একথা ঠিক যে 'ঘরে-বাইরে' পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে কোনো না কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কিন্তু 'গোরা' এক্ষেত্রে অনন্য কারণ 'গোরা' চরিত্রের জীবনের অনেক ঘটনায় রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের অনেক ঘটনা প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়।

অন্যদিকে ভূদেব চৌধুরী 'গোরা'-র আলোচনাকালে খুঁজেছেন সমকালীন 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের সমমনোভাব।

> "খেয়া'তেই কবি বুঝেছিলেন- মানব-ধর্মের মুক্তি মানব-আত্মার সমৃদ্ধিতে; দেশ-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন মানব-প্রেমের শক্তিতে। এই সত্যবোধকে বাঙলার তথা ভারতের প্রথম জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে 'গোরা'-র প্লট পরিকল্পনা করা হল। ... 'খেয়া'-র কবি-মনোভাব প্রেমের বাঁধনে মানবাত্মার মিলনমালিকা রচনা করেছে। সেই আদর্শ, সেই প্রত্যয় 'গোরা' উপন্যাসে বাঙালি জীবনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে সর্বজনীন ব্যাপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।" (চৌধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৫১-২৫২)

এই কাব্যগ্রন্থকে যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতায় চিহ্নিত করা হয় সেখানে ভূদেব চৌধুরী দৃষ্টিক্ষেপ করলেন এর রাজনৈতিক দিকটির প্রতিও। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও যে রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে এসেছিলেন তা আমরা জানি; সেই কারণেরই অনুসন্ধান করেছেন সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বরের প্রতিধ্বনির পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতাও অনুরণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এটা ঠিক যে 'খেয়া'-তে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়েও রাজনৈতিক নেতাদের ভাবনার সঙ্গে

মিলতে না পারা এবং আন্দোলন থেকে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান প্রত্যাহার করে নেওয়ার যন্ত্রণার প্রতিভাস। কাজেই এই দুটি ধারা যেমন 'খেয়া'-তে মিলিত হয়েছে তেমনই এই দুই ধারার মধ্যে থাকা মূলভাবও একভাবে প্রবাহিত হয়েছে 'গোরা'-র নানান চরিত্রের ক্রিয়া এবং সংলাপের মধ্যে দিয়ে।

এই ভূদেব চৌধুরীই আবার তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে উপন্যাসটির একটি দীর্ঘ আলোচনা করে একদিকে যেমন 'গোরা'-র রচনাকাল ও ঘটনাকালের মধ্যে থাকা হিসেবের গরমিলের প্রতি আলোকপাত করেছেন তেমনি এর প্রথম পাণ্ডুলিপি এবং বর্তমান পাঠের মধ্যে প্রতিতুলনা করে দেখিয়েছেন কীভাবে উপন্যাসটির সমাপ্তি অংশের বদল একে 'মহাকাব্যিকতা' দান করেছে। এসম্পর্কে সমালোচক চৌধুরীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য;

> "ভাবতে আশ্চর্য লাগে, "গোরা"র এই সমাপ্তিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বিপরীত রূপে কল্পনা করতে পেরেছিলেন,— সে খবর প্রথমে চিঠিতে লিখেছিলেন উইলি পিয়ার্সনকে; পরে বলেছিলেন বনফুলকেও। বনফুল তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।—
>
> হঠাৎ আত্মপরিচয় আবিষ্কৃত হবার অভিঘাতে গোরা 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হয়ে পড়ে, "সে নিজের ঘরে দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসেছিল। ..." রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, নিবেদিতার প্রবল নির্বন্ধেই নতুন রূপটি গড়ে দিতে হয়েছিলো পুরোনো গল্প ভেঙে।
>
> বনফুলের তবু মনে হয়েছিল, ঐ পুরোনো সমাপ্তিটা বুঝি 'আরো ভালো' হতে পারত। কিন্তু শিহরিত অনুভব ভরে ভাবতে হয়, তেমনটি হলে "গোরা"র 'মহাকাব্য'ধর্মী মাত্রাটি তৎক্ষণাৎ ধূলিসাৎ হয়ে পড়ত আরো পাঁচটা উপন্যাসের মতো ব্যক্তিগত ট্রাজেডি-তে, বিনয়-ললিতার প্রতি-চিত্রটি হয়ে গিয়ে। গোরার সেই উদ্ভ্রান্তি এবং সুচরিতার অবসরণ-পটে হোরা-চরিত্রের ভারত-ভাবিত উদাত্ত এপিক মাত্রাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তই। বর্তমান পাঠে গোড়া-সুচরিতার জীবন-পরিণামের সূত্রে ভারতপন্থায় অভিযাত্রীর নতুন সূচনা সম্ভাবিত হল। "মহাভারত"-এ মহাকাব্যের সমাপ্তি 'মহাপ্রস্থান'-এ, "গোরা"য় চিরন্তন ভারতবর্ষের সন্ধান গোরা-সুচরিতার সম্মিলিত মহাযাত্রায়।" (চৌধুরী। ২০১৬। পৃ. ৫৩)

উপন্যাসটির মহাকাব্যিকতা যে তার আয়তন বা বিস্তৃত পরিসরেই শুধু নেই তা যে মূলত উপন্যাসটির সমাপ্তির গঠনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তারই প্রতি আলোকপাত করে সমালোচক চৌধুরীর উক্ত মন্তব্যটি।

শচীন সেন তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "দেশ-সেবায় দেশের সমগ্র মূর্তি রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই গোরা যখন দেশের আংশিক মূর্তিকে পূজা করিয়াছে, গোরার সাধনা স্বার্থক হয় নাই। গোরা যখন জানিতে পারিল যে, সে কোন বিশেষ সমাজের নহে, সে সমস্ত দেশের তখনই তাহার চিত্তে প্রকৃত আলো উদ্ভাসিত হইল...।" (সেন। ১৩৪৬। পৃ. ২২২)

একটা কথা বুঝে নিতে হবে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের কিন্তু নানা ধারা, তার মধ্যে শুধু কাব্য-নাটক-উপন্যাস নেই; রয়েছে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও বেশ কিছু বিতর্কে অংশ নেওয়া প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং তাঁর জীবনচর্চা ও চর্যার ক্রম বিবর্তন। কাজেই এই সবটা মিলিয়েই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝে নিতে হয়। এই সমস্ত ধারার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝব রবীন্দ্র-সাহিত্যে আগাগোড়া দেশের সমগ্র মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়নি; একটা সময় ছিল যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অব্রাহ্মণ শিক্ষককে উচ্চবর্ণীয় ছাত্ররা প্রণাম করবে কি করবে না এই প্রশ্ন উঠেছিল এবং ফলস্বরূপ সেই শিক্ষককে শিক্ষাদানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রন্ধনশালার দায়িত্বে বহাল করা হয় (চিঠিপত্র ১৩। ১৪১৪। বিশ্বভারতী)। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ এখানে এ কারণেই প্রাসঙ্গিক যে গোরার ক্রমবিকাশ আসলে রবীন্দ্র-মননেরও ক্রমবিকাশের ফল।

এর আগে পর্যন্ত চলে আসা রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচনার যে রীতি, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মূলগত পার্থক্য নিরূপণ— সেই প্রচলিত পথে না এগিয়ে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচনা আরম্ভ করেছেন 'গোরা'-র আলোচনা দিয়ে। তাঁর সমালোচনার থেকে দুটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করব, যার জন্য বুদ্ধদেব বসু তৎকালীন সমালোচনার ধারা থেকে পৃথক। তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিয়ে নানা বিশ্লেষণ করে গেছেন; আর সেই বিশ্লেষণকালে সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছেন আনন্দময়ী চরিত্রকে। তাঁর মতে,

> "...আনন্দময়ীর কি কোনো বর্ণনা আছে? তিনি হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান কিছুই নন— তিনি পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁকে ভালো বললে কিছুই বলা হয় না, সৎ বললে ঠাট্টার মতো শোনায়, সকল ভালো-মন্দের উপরে কোনো-এক সহজ সত্যকে তিনি যেন লাভ ক'রেছেন আর তাঁর কোনো ভাবনা নেই। ... যদি ধ'রে নিই যে, ঔপন্যাসিক তাঁর নিজের চরিত্রের বিভিন্ন বৃত্তিগুলিকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিতরণ ক'রে দেন, তাহ'লে 'গোরা'তে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বলবো কাকে? বলা বাহুল্য, এই দাবি পরেশবাবুর নেই, স্বয়ং নায়কেরও না, সব তর্কের পরপারে রবীন্দ্রনাথ যেখানে স্থির হ'ইয়ে আছেন, তাঁর সেই আস্থার উক্তি আনন্দময়ীর মুখেই শুনতে পাই আমরা।" (বসু। ২০১৩। পৃ. ৭২)

বুদ্ধদেব বসুর এই মন্তব্য এককথায় স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ সমালোচক যেখানে গোরার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবিম্ব দেখতে চেয়েছেন সেখানে বুদ্ধদেব বসু একমাত্র সমালোচক যিনি আনন্দময়ীর মধ্যেই শুনলেন রবীন্দ্রনাথের স্বরের প্রতিধ্বনি। তবে এক্ষেত্রেও একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, যদি কেউ ভাবেন শুধুমাত্র আনন্দময়ীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মনন-চিন্তন প্রতিধ্বনিত হয়েছে তবে তাঁর ভাবনা ঠিক পথে এগোবে না। গোরার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটা পর্বের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, পরেশবাবুর মধ্যেও তেমনই। কাজেই একটা বিষয় বুঝে নিতে হবে উপন্যাসের বহু চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেইভাবনা এককালীন নয়, সেই ভাবনার বিবর্তিত ও বিবর্ধিত রূপই উপন্যাসটির নানা চরিত্রের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়।

অপরদিকে সমালোচক বসু উপন্যাসের নায়ক চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

> "সকলেই জানেন, আমাদের সাহিত্য নারীপ্রধান, স্মরণীয় নারী-চরিত্রের অভাব নেই সেখানে, কিন্তু যেসব নায়ক আলোচনার যোগ্য ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে— 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র বা বিহারী, 'চরিত্রহীনে'র সতীশ বা দিবাকর— তাদের কাউকেই ঠিক পুরুষ ব'লে মনে হয় না, তাদের 'বিপরীত' নায়িকাদের পাশে তারা শোচনীয় রূপে অযোগ্য। বলা বাহুল্য,সাহিত্যের মধ্যে এই অপৌরুষের ভাবটা জীবনের অবস্থা থেকেই জন্মেছে। পরাধীন দেশ, অক্ষম দেশ, তার উপর হিন্দুয়ানির অসংখ্য অন্ধতায় আবদ্ধ— এর মধ্যে পৌরুষের কোনো ক্ষেত্র ছিল না, ... সন্দেহ করি, রবীন্দ্রনাথ গোরাকে শ্বেতাঙ্গ তনয় ক'রেছেন, শুধু গল্প জমাবার উদ্দেশ্যে নয়, তাঁর মনের তলার এই কথাটাও ছিল যে, এই দার্ঢ্য, এই আত্মনির্ভর নির্ভয় শক্তি তাঁর সমসাময়িক বাঙালি পুরুষের চরিত্রলক্ষণ নয়— খাশ বাঙালি দেখতে চাও তো মহিমকে দেখ।" (পৃ. ৭৮)

বুঝতে পারি, উপন্যাসটির নায়ক চরিত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সমালোচক বসু নিজস্ব চিন্তন-ধারার প্রয়োগ করেছেন। তৎকালীন পরাধীন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাধারণ পুরুষ সমাজের যে পাশবদ্ধ দশা সেই দিকে আলোকপাত করে উপন্যাসের নায়ক চরিত্রকে শ্বেতাঙ্গ তনয় করে তোলার কারণ অন্বেষণ করেছেন সমালোচক। এখানেও একটা প্রশ্ন বা 'কিন্তু' গবেষক মনে উঁকি মেরে যায়। সমালোচকের মত যদি মেনে নিয়ে উপন্যাসের প্লটকে নতুন করে ভাবি, অর্থাৎ যেখানে নায়ক চরিত্র শ্বেতাঙ্গ বা বিদেশীয় নয়, বরং ভারতবর্ষেরই ভূমিপুত্র; তাহলে কি গোরার যে ট্র্যাজেডি তা সেভাবে দানা বাঁধতে পারে? যার সঙ্গে ভারতীয়ত্বের কিছুমাত্র সংযোগ নেই তার সমস্ত কিছুর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাণকে খুঁজে

ফেরার চেষ্টার মধ্যে যে কারুণ্য এবং 'স্যাটায়ার' দুই-ই রয়েছে তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের ভূমিপুত্রের (সে হোক না পালিত অনাথ সন্তান) সেই একই কাজ করার মধ্যে থেকে কি একইরকম প্রভাব পাঠকমনে তৈরি হবে? হয়তো না। কাজেই বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য "রবীন্দ্রনাথ গোরাকে শ্বেতাঙ্গ তনয় ক'রেছেন, শুধু গল্প জমাবার উদ্দেশ্যে নয়"— এই মন্তব্যের সপক্ষের পরিবর্তে বিপক্ষেই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবনা বেশি চোখে পড়বে। সমালোচনার নিজস্ব রীতিতে তিনি এক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে নানা উদাহরণ তুলে এনেছেন উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণকালে। ম্যাক্সিম গোর্কি, সমার্সেট মমের রচনার প্রসঙ্গ এনে তিনি আলোচনা করেছেন উপন্যাসের চরিত্রগুলির। পাশাপাশি এই বিদগ্ধ সমালোচনার ধারায় মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রথম কৈশোরকালে এই উপন্যাস পড়ার অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গকেও।

উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাতের তারা দিনের রবি' গ্রন্থে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,

> "গোরা কি পেরেছিল তার অভিজ্ঞতাগত রিয়ালিটিকে পরিবর্তিত করতে? যে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় সে ছিল উন্মথিত, সে বিচ্ছিন্নতার শিকড় সে খুঁজেছে ঠিকই, তার জন্য সে কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছে, সকলের হয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করেছে— এও ঠিক কথা, কিন্তু লছমির হাতে জল খেতে সম্মতিজ্ঞাপনের সিদ্ধান্তের সবটা কি তার স্বোপার্জিত, না কি, তার জন্মবৃত্তান্তের রহস্য উন্মোচনের ধাক্কায় সে সিদ্ধান্ত অনেকটা অগত্যা হয়েছে— এ প্রশ্ন থেকেই যায়।" (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ. ৭৪)

একথা ঠিক, গোরার শেষটা কিছুটা হলেও আকস্মিক মনে হয়। সে যে আনন্দময়ী-কৃষ্ণদয়ালের সন্তান নয়— এই সত্য জানার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে লছমির হাতে জল খেতে চেয়েছে; এই পরিবর্তনটা আকস্মিক হয়েছে; বিবর্তিত পথে এগোয়নি। এমনকি, লছমির হাতে জল না খাওয়ার সংস্কার তাকে ইতিপূর্বে মনের সংগোপন স্তরেও দুঃখিত করেছে বলে উপন্যাস পাঠে অন্তত জানা যায় না। কাজেই সমালোচকের এই মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে সংগত হয়েছে বলেই বিশ্বাস করি।

এই উপন্যাসটির কেন্দ্রিয়ভাব ধরা পড়েছে অর্চনা মজুমদারের আলোচনায়। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"আমাদের মনে হয় কবি গোরাকে এমন একটি মানুষ বলে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন যাকে পৃথিবীর নাগরিক (Citizen of the world) বলা যেতে পারে। অর্থাৎ গোরা এমন একটি মানুষ যে ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে বদ্ধ নয়।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।

বলে কবি যে ঘর খুঁজেছেন গোরা সেই ঘরেরই বাসিন্দা। আইরিশ-দম্পতির সন্তান ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর নাগরিকের প্রতীকরূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এইজন্যেই যখন রোগশয্যায় কৃষ্ণদয়াল গোরার পিতার নাম প্রকাশ করতে গেলেন, গোরা গর্জন করে বলে উঠল—"দরকার নেই তাঁর নাম। আমি নাম জানতে চাই নে।" বিশ্ব ও ভারতের মিলনের ছবি যে-কবি দেখেছেন, তাঁর পক্ষে গোরার জন্ম ও লালনপালনের ইতিহাস এইভাবে বিশ্ব ও ভারতের পরিধির সমন্বয়ের মধ্যে গড়ে তোলা ছাড়া উপায় ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে একটি প্রধান সত্যসিদ্ধান্ত হচ্ছে মানুষকে জাতীয়তার গণ্ডি ছাড়িয়ে একটি আন্তর্জাতিকমানব রূপে দেখতে হবে।" (মজুমদার। ২০১৭। পৃ. ৫৯)

মূলের কথাটাই আসলে তাই। গোরার উগ্র হিন্দুত্ব থেকে শেষে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের হয়ে ওঠার বিবর্তনটাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। আর এই বিবর্তন যে শুধুমাত্র উপন্যাসের খাতিরে নয়, তা যে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রতিফলন তা সুকুমার সেন ও অন্যান্য বহু সমালোচক বিভিন্ন সময়ে নির্দেশ করে গেছেন। আর সেই দিকটিতেই নিজের বক্তব্যের সারমর্মকে স্থাপন করেছেন সমালোচক মজুমদার।

রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থের উল্লেখ করে আমরা উপন্যাসটির আলোচনার সমাপ্তির পথে এগোব, গ্রন্থটি সৈয়দ আকরম হোসেনের 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ'। গ্রন্থটিতে উপন্যাসটির প্লট-বিভাজন সম্পর্কে আলোচনাকালে সমালোচক মন্তব্য করেছেন,

"গোরা নিশ্ছিদ্রপ্রায় শিল্পনিপূণ উপন্যাস। এর প্লটগঠনরীতি উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় উপন্যাসের আঙ্গিক অনুসারী। ঔপন্যাসিকের তীব্র তত্ত্ববাসনা এ উপন্যাসের কাহিনীকেন্দ্রের প্রাণাবেগ ও দ্বন্দ্বময়তা ক্ষুণ্ণ করেনি। গোরার বিশাল প্রেক্ষাপট ও বিপুল জীবনপ্রবাহের মধ্যেও এর কালগত সংহতি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। ...গোরা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বভাবনা ও শিল্পবোধ নির্দ্বন্দ্ব; গভীরতম চেতনামূলে ঐকান্তিক। কারণ ঔপন্যাসিকের জীবন সমাজ-কাল ও ইতিহাস-অভিজ্ঞতার উষ্ণ এবং সুস্থির মর্মমূলে শিকড় প্রসারিত করে গোরা বিকশিত, শিল্পিত।" (হোসেন। ২০১১। পৃ. ১৬৬)

এই উপন্যাসটির আলোচনাকালে গুরুত্ব পায় ভিন্ন ঘরানা থেকে বিশ্লেষিত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ তপোব্রত ঘোষের 'গোরা আর বিনয়' গ্রন্থটি। সমালোচক ঘোষ সংস্কৃত ও বৈষ্ণব সাহিত্যতত্ত্ব থেকে উদাহরণ তুলে উনিশ শতকের দুই পুরুষের বন্ধুত্বের বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন ভিন্ন রীতিতে। তিনি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন 'রতি' আসলে চিত্তরঞ্জক একটি ক্রিয়া যা দুই স্ত্রী-পুরুষের সমান্তরালে দুই স্ত্রী অথবা দুই পুরুষের মধ্যেও ঘটতে পারে;

> "২. এই রতি দুরকম : সম্প্রয়োগবিষয়া আর অসম্প্রয়োগবিষয়া। 'সম্প্রয়োগ' মানে 'স্ত্রী-পুরুষ ব্যবহার'। অর্থাৎ, দেহসঙ্গমের ফলে যখন স্ত্রী-পুরুষের চিত্ত রঙিয়ে ওঠে তখন তা সম্প্রয়োগবিষয়া রতি। আর যেখানে দেহসঙ্গম ছাড়াই চিত্ত রঞ্জিত হয়, তা অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি। এই অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও থাকতে পারে, আবার দু'টি স্ত্রী বা দু'টি পুরুষের মধ্যেও তা থাকা সম্ভব।" (ঘোষ। ২০১৩। পৃ. ১৫)

এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই তপোব্রত ঘোষ উপন্যাসটির কাহিনিকাল এবং সামাজিক পরিস্থিতির আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে নারীবর্জিত ছাত্রজীবনে কীভাবে দুই ভিন্ন মানসিক গঠনের পুরুষ বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যার মধ্যে মিশে যায় অসম্প্রয়োগবিষয়া রতির অভিঘাত। নারীবর্জিত জীবনে সদ্য যৌবনে পা-রাখা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে দুই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করা যুবকের বন্ধুত্বের মধ্যে মান-অভিমান যে সমকামিতার চিহ্নবাহী নয় সে বিষয়ে অধ্যাপক ঘোষ সতর্ক করে মন্তব্য করেছেন (ঘোষ। ২০১৩। পৃ. ৭১)। একথা ভেবে দেখবার যে সমস্ত নারী-পুরুষের মধ্যেই যুগপৎ নারীত্ব ও পুরুষত্ব মিলে মিশে থাকে। কোনো নারীর মধ্যে পুরুষত্বের ভাব বেশি থাকে আবার কোনো পুরুষের মধ্যে নারীত্বের ভাব বেশি থাকে, এবং এটা যে সবসময় শারীরিক ভঙ্গিমার মাধ্যমে ফুটে ওঠে তা নয়। কাজেই গোরার প্রতি বিনয়ের অসম্ভব আনুগত্য শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে নয়, গোরার পৌরুষের কাছেও। এই যে গোরা আর বিনয়ের বন্ধুত্বের মধ্যে যুগপৎ অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি এবং মৈত্রীরতির চিহ্ন অন্বেষণ এই উপন্যাসের সমালোচনার ধারায় সম্পূর্ণ ভাবে অনন্য।

৬. চতুরঙ্গ:— আমরা জানি এই উপন্যাস পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'ঘরে-বাইরে'-র পূর্বে প্রকাশিত হলেও দুই উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশের কালটা এক- ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ। এবং হয়তো 'ঘরে-বাইরে'-র সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলোড়ন তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এই দশকে সরসীলাল সরকারের 'চতুরঙ্গে'র সমালোচনাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রথাগত চরিত্র

এবং ঘটনা পরম্পরার কার্যকারণ বিশ্লেষণ সমন্বিত সমালোচনার যে ধারা সেইকালে প্রবহমান ছিল তার থেকে কিছুটা ভিন্ন অবস্থান রাখতে সক্ষম হয় সরসীলালের মনস্তাত্ত্বিক তথ্য সম্বলিত সমালোচনাটি। সমালোচনাটির সূচনাতেই সমালোচক উপন্যাসটি যে ভিন্ন ঘরানার তার উল্লেখ করে বলেন,

> "এই পুস্তক লেখার ভঙ্গি দেখিয়া বোঝা যায় বিভিন্ন চরিত্রে মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্র কিভাবে পরিস্ফূরিত হইতেছে।" (সরকার। ১৩৬৯। পৃ. ৩০১)

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস গঠনের প্রয়োজনেই যে এর বয়নরীতি ও কথনরীতি প্রচলিত ধারার থেকে সরে এসেছিলো তা সমালোচকের নজর এড়ায়নি। মনে রাখতে হবে, সময় ততদিনে এসে পৌঁছেছে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার যে নানা বদল ও নানা রীতির আলোচনা করা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য তার অন্যতম বাঁক বদলের সূচনা এই পর্যায় থেকেই ঘটতে আরম্ভ করেছিল। ইতিপূর্বে সমালোচক ও পাঠকদের ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, মানসিক ও শিক্ষাগত সীমাবদ্ধতা বা ব্যক্তিগত ভালো কিংবা মন্দ-লাগার প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত সমালোচনার পরিবর্তে ধীরে ধীরে স্থান পেতে আরম্ভ করল পাশ্চাত্য নানা তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে নির্মিত সমালোচনার চর্চা। আর এই বদলের ইতিহাসটাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা সমালোচনার পদাঙ্ককে অনুসরণ করেই।

সুকুমার সেন ইতিপূর্বে যে নিজস্ব রীতিতে উপন্যাসগুলির আলোচনা করে আসছিলেন 'চতুরঙ্গে'-র সমালোচনার সূচনায় তার যথার্থ প্রকাশ ঘটল;

> "রবীন্দ্রনাথের বড়গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে মিল দেখা যায় জোড়া জোড়া, পরস্পর দুইটিতে। যেমন 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি', 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' ও অব্যবহিত পরবর্তী উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'-র সঙ্গে সম্পৃক্ত।" (সেন। ১৩৫৩। পৃ. ৪০১)

এতদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে রীতিতে উপন্যাস রচনা করছিলেন তার থেকে সরে এসেছিলেন 'চতুরঙ্গ'-তে। এর বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের প্রতি আলোকপাত করে সমালোচক একে যেমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারায় কঠিনতম তেমনই এর অভিনব গঠনরীতিকে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন;

> "চতুরঙ্গের গঠনরীতি সাধারণ উপন্যাসের মতো নয়। বইটির চারিটি 'অঙ্গ' বা 'ভাগ'- 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'- যেন চারিটি স্বতন্ত্র কাহিনী। এগুলি স্বতন্ত্র

> গল্পরূপেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারিটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গল্পের মধ্য দিয়া একই কাহিনী পরিণতিরদিকে আগাইয়া গিয়াছে। (পৃ. ৪০১)

চতুরঙ্গের মূল সমস্যা দ্বিবিধ, যার একটি ধারা গেছে প্রেমের ধারণার দিকে এবং আরেকটি ধারা গেছে আধ্যাত্মিকতার দিকে। এই বিষয়টি নিয়ে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য;

> "সব প্রেম প্রেম নয়', অর্থাৎ সব প্রেম জীবনে চরিতার্থতা আনিয়া দিতে পারে না। এক প্রেম হইতেছে তাঁহার ধ্যানের ধন, অন্তরের গুরু- আর এক প্রেম হইতেছে তাঁহার সাধনার দেবতা, দেহের প্রাণ। এই দুই প্রেমের দুর্নিবার দোটানায় পড়িয়া নারীহৃদয়ের বেদনাপূর্ণ দ্বন্দ্ব 'শেষের কবিতা' হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল পরবর্তী গল্প-উপন্যাসেরই মুখ্য অথবা গৌণ সমস্যা। এই সমস্যা সর্বপ্রথম চতুরঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে।" (পৃ. ৪০২)

দ্বিবিধ প্রেম সম্পর্কিত যে সমস্যা যা 'শেষের কবিতা'-তে দীঘির জল এবং ঘড়ার জলের রূপ পাবে সেই দ্বিবিধ প্রেম নিয়ে নারী মনস্তত্ত্বের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। প্রতিটি চরিত্রের মনস্তত্ত্বের কারণ অন্বেষণ ও তার বিশ্লেষণের পাশাপাশি নিজস্ব জ্ঞানের ও চিন্তাধারার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রেখে গেছেন সমালোচক। এই উপন্যাসের সমালোচনাতেও শচীশের দামিনীর প্রতি অস্পষ্ট আকর্ষণ এবং তাকে ত্যাগের অনুরোধের মধ্যে 'বোষ্টমী' গল্পের ছায়াপাত দেখেছেন তিনি। এই উপন্যাসের নামকরণের বিশ্লেষণ সুকুমার সেনের হাতে পূর্ণতা পেয়েছে। 'চতুরঙ্গ'-এর যে দ্বিবিধ সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে তারই প্রেক্ষিতে এর নামকরণের বিশ্লেষণও করা সম্ভব। একদিকে দামিনী-শচীশ-শ্রীবিলাসকে ঘিরে যে প্রেমসম্পর্কিত সমস্যা, সেদিক থেকে যেমন এর নামকরণের কারণ বিশ্লেষণ করা যায় তেমনই শচীশের আধ্যাত্মিকতার দ্বান্দ্বিক যাত্রাপথের দিক থেকেও সেই কাজটি করা সম্ভব; আর সেই সম্ভাব্যতারই অভিমুখের নির্দেশ করেছেন সুকুমার সেন মহাশয়।

সমালোচক ভূদেব চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে আলোচনার তৃতীয়ভাগে তিনি রেখেছেন 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'-র আলোচনাকে এবং এদের একত্রে চিহ্নিত করেছেন 'পরিণতি যুগের কথাসাহিত্য' হিসেবে। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> "রবীন্দ্র-উপন্যাস সাহিত্যের কাব্যধর্মিতা লাভ সম্পূর্ণহয়েছে 'চতুরঙ্গ'-তে এসে।" (চৌধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৬৬)

প্রতিটি উপন্যাস আলোচনাকালে তিনি যেমন সমকালীন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সমপর্যায়ের রসের অন্বেষণ করেছেন তেমনই প্রায়শই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কৃত রবীন্দ্রজীবনী থেকে উদ্ধৃতি ও ভাবনা গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসগুলিকে দেখেছেন মূলত গীতিকবির লেখা উপন্যাস হিসেবে। 'চতুরঙ্গের' গঠনশৈলীর প্রশংসার পাশাপাশি এর প্লট ও ভাষাশৈলী নিয়েও স্বল্পবাক্যে নিপুণ মত প্রকাশ করেছেন। 'চতুরঙ্গ'-এর মূল একটি প্লটে যে চারটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটেছে যাদের অনন্যতা প্রকৃতপক্ষে একমুখীনতার মধ্যে রয়েছে সেই বিষয়টি লক্ষ করেছেন ভূদেব চৌধুরী। পাশাপাশি এর প্রতীকধর্মী ভাষা ব্যবহারের প্রতিও আলোকপাত করেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংকলনে এই উপন্যাস সম্পর্কে লিখলেন,

> "পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত হলে এই গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে শক্তিশালী উপন্যাসের গৌরব লাভ করতে পারত।" (দত্ত। ১৯৫৯। পৃ. ৭০)

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতোই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এই উপন্যাসটিকে খাপছাড়া মনে হয়েছিলো কিছু ক্ষেত্রে।

উপন্যাসটির গঠনের এই খাপছাড়া ভাব যে আসলে স্বতঃপ্রণোদিত তারই বিশ্লেষণ করে ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> "চতুরঙ্গ" চারটি গল্পের একত্রবদ্ধ রূপ, প্রমথ চৌধুরীর "চারিইয়ারি কথা"র মতো; নাকি যথার্থই উপন্যাস, এ-নিয়েও মতান্তর আছে। অন্তত এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, "সবুজপত্র"তে 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায় প্রকাশের পরে একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প বলেই মনে হয়েছিল ওটি। অতচ পরবর্তী অধ্যায় শেষ যেখানে হল, সে-যেন ডালপালা ছড়ানো এক বড়ো গল্পের, ছোটোগাল্পিক ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ থমকে পড়া। তারই অনুসৃতি ভরে শুরু 'শচীশ' অধ্যায়ের; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুসংবাদ ঐ অধ্যায়েরই অন্তর্গত, পরবর্তী অংশ সেই দুর্ঘটনারই পরিণতি শচীশের জীবনে। 'শচীশ' অধ্যায়েরও অবসান চমকপ্রদ, যদিও সবটাই ছোটগল্পোচিত না-ও হতে পারে। আবার ঐ গুহা ঘটনার প্রসঙ্গ ধরেই 'দামিনী' অধ্যায়ের আরম্ভ; তার সমাপ্তি অসাধারণ নাটকীয় চমৎকারিতায়— শ্রীবিলাস-দামিনীর বিবাহ-সংবাদ দিয়ে। তারই ব্যথাবহ উপসংহার 'শ্রীবিলাস' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে। কাহিনীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অন্তঃসংহতি সুসংহত; তবু বহিরাঙ্গিক কার্যকারণ সম্পর্কের গাঁথুনি কেবলই গেছে ফস্কে। উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ 'ন্যারেটিভ' গঠনকে সে স্বীকার করে নি। করবার উপায় ছিল না—অন্তশ্চৈতন্যের সমুদ্ভাস এ-উপন্যাসকলার অন্বিষ্ট, তারই প্রতিফলনে এ-প্রচেষ্টার কুশলী সমাপন। যে জীবন-চেতনা দুশ্চর, দুরধিগম্য, তার ভাষা-বাহন তির্যক অন্তর্ভেদী; সহজ গঠন তার অবিমূর্ত।" (চৌধুরী। ২০১৬। পৃ. ৬৫)

আসলে এই যে উপন্যাসটির গঠনের মধ্যে আপাতভাবে ধারাবাহিকতা বা বলা ভালো সামগ্রিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় তার কারণ যে আসলে এর কথনরীতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে সেই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন সমালোচক। শ্রীবিলাস যখন নিজের ডায়ারিতে লিখছে তখন যে সে আসলে তার জীবনের নানান বিচ্ছিন্ন সময়ের ঘটনার অভিঘাতটাই লিখেছে সেই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন সমালোচক।

উপন্যাসটি নিয়ে প্রায় একই আঙ্গিকের মন্তব্য করেছেন সৈয়দ একরম হোসেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ' গ্রন্থে। তিনি উপন্যাসটিকে 'বিতর্কিত ও সন্দিগ্ধ শিল্পকর্ম' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন,

> "চতুরঙ্গের আঙ্গিক ও শিল্পোৎকর্ষ নিয়ে বিতর্কি ও সন্দেহের কারণ, প্রথমত, এর অপূর্বতা ও অত্যাধুনিকতা; দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের আঙ্গিক-বিষয়ক প্রথাগতরীতির প্রতিফলন চতুরঙ্গে প্রত্যাশা করা; তৃতীয়ত, চতুরঙ্গের প্রতিটি কিস্তি ভিন্ন শিরোনামায় 'সবুজপত্রে' প্রকাশ।
>
> জাঁ পল সার্ত্র ব্যতীত সম্ভবত আর কোনো দার্শনিক সার্থক উপন্যাস রচনায় সমর্থ হননি এবং জীবনদর্শনবিহীন ও জীবনার্থবিবিক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষেই মহৎ সৃষ্টি অস্মভব। ...এ কথা রবীন্দ্র-উপন্যাস সম্পর্কে আরো নির্ভুল।
>
> রবীন্দ্রসাহিত্যে এ তত্ত্ব বহুবার উচ্চারিত যে, জীবনে গতিবাদ ও স্থিতিবাদ— কোনোটিই সত্য নয়, এবং উভয়ই সত্য। কারণ গতি ও স্থিতির সুসামঞ্জস্য ও সংশ্লেষণী থেকেই আসে পূর্ণতা।" (হোসেন। ২০১৬। পৃ. ২০৩)

শচীশের জীবনের সত্যের অন্বেষণের পথটিকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত যে কেন বিবৃত রাখা হল তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় সমালোচকের মন্তব্যের মধ্যে। স্থিতি ও গতি, তথ্য ও তত্ত্ব, ইতি ও নেতির যুগপৎ মিলনেই যে সত্যের যথার্থ প্রকাশ তা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এই উপন্যাসটিতেও ফুটে উঠেছিলো, বস্তুতপক্ষে এটিই উপন্যাসটির মূল বক্তব্য। সমকালীন বহু সমালোচক এই তত্ত্বটিকে অনুধাবন করতে পারেননি বলেই তাঁদের কাছে উপন্যাসটির পরিণতি অসম্পূর্ণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিলো।

অন্যদিকে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে অশ্রুকুমার শিকদারের সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি এই উপন্যাসের সমালোচনার ধারার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ,

> "...প্রাক্তন নাস্তিক খুঁজে ফিরছে কাকে বলে আস্তিকতা। ইতি-নেতির ডায়ালেকটিকের মধ্য দিয়ে এই বোধির সিনথেসিসে উত্তীর্ণ হওয়াটাই চতুরঙ্গের থীম। সেই থীমকে আশ্রয় দেবার জন্য যে

কয়টি চরিত্র, যে যৎসামান্য বাস্তব পরিবেশ না আনলে নয়, মাত্র ততটুকুকেই রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে জায়গা দিয়েছেন।" (শিকদার। ১৩৮০। পৃ. ৩৮)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যগুলি স্মরণে রেখে বলা যায়, 'গোরা' উপন্যাসের আয়তনিক এবং পটভূমিক বিশালতার পরে 'চতুরঙ্গ'-এর আয়তনগত ক্ষুদ্রতা এবং বর্ণনা ও মন্তব্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে স্বল্পতা দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে তৎকালীন বহু বিশিষ্ট সমালোচক দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন। অনেকেরই মনে হয়েছিলো উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ, শচীশ একটি খাপছাড়া চরিত্র। কিন্তু বর্ণনার অস্পষ্টতা, আবছায়া আঁধারের আড়ালের থেকে মন্তব্য কিছুটা বলা কিছুটা না বলাই যে এই উপন্যাসের মূল ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য মণ্ডিত হয় এই বিষয়টি অধিকাংশ সমালোচকই উপলব্ধি করতে পারেননি। আসলে তখনও পর্যন্ত কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনার ধারায় একটা বস্তুগত তথ্য অন্বেষণের প্রবণতা অব্যাহত ছিল; যার জের ধরে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের আত্মমগ্নতার বিষয়টি বহু সমালোচকই অনুধাবন করতে পারেননি। এবং সেই বিষয়টির প্রতি মোটের ওপর আলোকপাত করেছিলেন অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদার, এবং তাঁর সমালোচনাটি 'চতুরঙ্গ'-এর সমালোচনার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ।

আবার মনোরঞ্জন জানা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)' গ্রন্থে উপন্যাসটির বিশ্লেষণকালে বলেছেন,

"কোন একটি উপায়ে মানবিক বোধের সীমাকে ছাড়াইয়া উঠা বা সেই উর্দ্ধতর চেতনার আভাসমাত্র লাভ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা নয়। তাহাতে পরিণামে জীবন ও জগতটাই অস্বীকৃত হইয়া যায়। প্রাণ-মন-বুদ্ধি সমেত মানবিক সমগ্র বোধের ধীর অনুশীলন ও সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টার ভিতর দিয়া যেখানে স্বাভাবিক ভাবে উন্নততর চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং জীবনে তাহার প্রাপ্তি ঘটে সেখানে এই দুটি সত্তার পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয় এবং জীবন ঐ বোধাশ্রয়ী হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, আশ্চর্য্য গুণ সমৃদ্ধ হয়, জীবন এক নূতন অর্থ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল লাভটিকে শচীশের পরিণত অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সেখানে রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে। কোন একটির মধ্যে মূল্যের নূন্যতা কিছুমাত্র নাই। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া এবং এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়া উভয়ের যোগের রহস্য অনুসন্ধানে শচীশের মতো রবীন্দ্রনাথও ধ্যান নিমগ্ন হইয়াছেন। এই সাধনারই একটি দিক শ্রীবিলাস-দামিনীর মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। যে প্রেমে অসীম সীমা রূপ লাভ করিয়াছেন, সেই এক প্রেম নর-নারীর মধ্যে।" (জানা। ১৯৬০। পৃ. ২৬৪)

সমালোচক জানার মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র জীবনী ২'-তে এই উপন্যাস সম্পর্কিত মন্তব্যে,

> "... বলাকার মধ্যে কবির যেসব তত্ত্বকথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনদর্শনের মূলগত কথা। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে, জীবনে গতিবাদ ও স্থিতিবাদ— কোনোটিই সত্য নয় আবার উভয়ই সত্য বটে। কারণ জীবনের মধ্যে গতিস্থিতি মিশিয়া আছে বলিয়া পূর্ণতার মধ্যে উহা সার্থক। এই পূর্ণতাকে বিশ্লিষ্টভাবে দেখিলেই সত্য আচ্ছন্ন হয়; এই পূর্ণতার মধ্যে রূপ-অরূপ উভয়ই সংশ্লিষ্ট— একান্তভাবে একটিকে লইলে উভয়ই মিথ্যা হইয়া যায়। গতি-স্থিতি, রূপ-অরূপ, রাত্রি-দিন, আলো-আঁধার প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীতের যথার্থ সমবায় ও সমন্বয়ে জীবন অর্থপূর্ণ। শচীশের জীবনে গতি স্থিতি ও পূর্ণতার তিনটি স্তরই কবি ব্যক্ত করিয়াছেন..." (মুখোপাধ্যায়। ১৩৬৮। পৃ. ৪১৭)

অথবা এপ্রসঙ্গে আমরা আনতে পারি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে,

> "চতুরঙ্গ'-এর চার অংশের তিনটিতে প্রধান কথা শচীশ। স্বয়ং-সম্পূর্ণ তিনটি অংশের বিবৃত সমাপ্তি বা open ending যেন একথাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে শচীশের সত্যান্বেষা শেষ্পর্যন্ত একটা অসমাপ্ত ব্যাপার। (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ.৭৬)

মনোরঞ্জন জানা কিংবা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কিংবা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য গুলির পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের স্মরণে এসে যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কথা কিংবা আরো পরে লেখা পংক্তিগুলি 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', কিংবা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি। এই রচনাগুলির মূল বক্তব্য, জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মমগ্ন হওয়াতেও যেমন সত্যকে পাওয়া যায় না তেমনই শুধু বস্তুগত জীবন ও জগতকে আঁকড়ে ধরেও পরমসত্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি অসম্ভব। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জীবনচর্চার প্রতি আলোকপাত করলে আমরা দেখব এই দুই ধারা যেমন পৃথকভাবে তাঁর জীবনে এসেছে, তেমনই এই উপলব্ধিও তাঁর মধ্যেই এসেছিলো যে 'সবকে মিলিয়ে দেখলেই' মুক্তি। এবং বলা-বাহুল্য ঔপন্যাসিকের এই উপলব্ধির স্তরগুলিই 'চতুরঙ্গ'-এর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও তাঁর মননে পরম-সত্যকে পূর্ণরূপে পাওয়ার উপলব্ধি একদিনের নয়, এবং 'চতুরঙ্গ' রচনার কাল-পর্বে সেই উপলব্ধি পূর্ণতা পায়নি বলেই শচীশের 'সত্য'কে জানার অন্বেষার পথটিও বিবৃত রয়ে গেছে উপন্যাসের শেষে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কথাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে "চতুরঙ্গ" ও "ঘরে-বাইরে"-র আলোচনা করেছেন একটি মাত্র প্রবন্ধে। এর কারণ হতে পারে দুই উপন্যাসের কথনরীতির মধ্যে সামঞ্জস্য ও রচনাকালের হিসেবে এরা কাছাকাছি। কিন্তু তবুও এই দুই উপন্যাসের

মধ্যে মিলের পাশাপাশি অমিলও রয়েছে প্রচুর। সমালোচক বসু এই উপন্যাসের ভাষা ব্যবহার নিয়ে আলোচনাকালে উল্লেখ করেন,

> "চতুরঙ্গে' সংলাপসুদ্ধু সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু তার বিন্যাস এমন সংযত, আর ভঙ্গি এত সহজ যে পুরো বইটি প'ড়ে ওঠার পর হঠাৎ যেন আমরা সবিস্ময়ে উপলব্ধি করি যে, এতক্ষণ ধরে সাধুভাষা পড়ছিলাম। চলতি ভাষার আত্মিক গুণ রবীন্দ্রনাথ এতে সঞ্চারিত করেছেন, শুধু চেহারাটা রেখেছেন সাধুভাষার।" (বসু। ২০১৩। পৃ. ৮৮)

সমালোচক 'ঘরে-বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ' নিয়ে একযোগে আলোচনার কালে এদের রচনা শৈলীগত পার্থক্যের উল্লেখ করেও মূলত আলোচনা করেছেন এই দুই উপন্যাসের ভাষা নিয়ে। সাধুভাষায় লেখা শেষ উপন্যাস এবং চলিত ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি কি কৃত্রিমতা এবং জটিলতা উপলব্ধ হয় তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। ক্রিয়াপদের চলিত রূপই যে চলিত আর সাধুভাষার একমাত্র পার্থক্য নয় সে বিষয়টি বুদ্ধদেব বসুর এই সমালোচনায় সুস্পষ্ট-রূপে ফুটে উঠেছে।

অপরদিকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উজ্জ্বল কুমার মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাতের তারা দিনের রবি' গ্রন্থে তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করেছেন,

> যা সরাসরি বর্ণনা করলে নাটকীয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল শ্রীবিলাস তাকে বিনয়ে অ্যাভারেজ ঘটনা বলে প্রতীয়মান করাতে চেয়েছে। তাতে ঘটনা বা চরিত্র কেউই অ্যাভারেজ হয়ে যায়নি, কেবল শ্রীবিলাসের দায়িত্বজ্ঞান যে কত অসাধারণ তা বিনয় সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি উন্মোচিত স্তরে শচীশের গল্প। কিন্তু নিহিত স্তরে এ তো শ্রীবিলাসের গল্প। এ তো একান্ত শ্রীবিলাসেরই অভিজ্ঞতা।" (বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৪২৪। পৃ.৭৬)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের যে দিকটির প্রতি আলোকপাত করলেন, তা ইতিপূর্বে কোনো সমালোচক করেননি। উপন্যাসটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি এ শুধু আত্মকথনরীতির প্রয়োগ নয়। দামিনীকে দাহ করার পরে শ্রীবিলাস তার জীবনের স্মৃতি পর্যালোচনা করেছে, যেখানে নানান ঘটনার বর্ণনায় সঙ্গত করেছে শচীশের ডায়ারি। আর শ্রীবিলাসের এই স্মৃতির পর্যালোচনাও আসলে মৌখিক নয়, লিখিত— উপন্যাস পাঠেই আমরা জানি তার ছিল ডায়ারি লেখার নেশা। আর এই কারণেই, এই সূত্র ধরেই গড়ে ওঠে 'চতুরঙ্গ'-এর ভিন্ন পাঠ; রচিত হয় 'শ্রীবিলাসের ডায়ারি'-র মতো গ্রন্থ।

‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ ‘দামিনীর গান’ শীর্ষক প্রবন্ধে। এখানে লিখছেন,

> “দামিনীর অন্তমুহূর্তের বিবরণে ছিল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র উঠছিল ফুলে ফুলে, দামিনী আর সমুদ্র যেন একাকার হয়ে যাচ্ছিল সেই বর্ণনায়। বিষ্ণু দে তাই লিখতে পেরেছিলেন ‘তোমার সমুদ্র’ বা ‘সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে’। হয়তো সেইজন্যেই, আগেপরে অন্য কোনো সংযোগ না থাকলেও ‘মানসী’-র ওই কয়েকটি লাইনও দামিনীর আত্মকথার মতো হয়ে ওঠে : ‘আমি যেন ঐ অসীম পাথার’। গোটা উপন্যাস জুড়ে আকাশকে চৈতন্য আর জলকে প্রকৃতি হিসেবে সাজিয়ে নেবার একটা আয়োজন ছিল ‘চতুরঙ্গ’র মধ্যে, শেষ পূর্ণিমায় এ-দুয়ের এক অন্তিম সংযোগ যেন তৈরি হলো। পুরোনো কোনো লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নূতন একটা লেখার এক যোগসূত্রও তৈরি হয়ে গেল তখন।” (ঘোষ। ২০২০। পৃ.১৯৭)

এবং শুধুমাত্র ‘মানসী’র কবিতাই নয় দামিনীর জীবনের ধ্রুবপদ হিসেবে টেনে এনেছেন রবীন্দ্রনাথেরই এক অতিচর্চিত পূজা-পর্যায়ের গানকে,

> “পৃথিবী আমারই জন্য সাজিয়ে রাখে বরণমালা, আকাশ আমারই জন্য জ্বালিয়ে রাখে তারা। ...দামিনীরও মনে হতে পারত ওই বরণমালার কথা, আকাশে আকাশে লক্ষ প্রদীপ জ্বালার কথা। তারও মনে হতে পারত : ‘প্রেম বলে যে যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে’-র মতো এক আশ্বাসের কথা। ...শুধু, এই চলে যাবার মুহূর্তে, ‘সাধ মিটিল না’ বলতে পারবার মতো কোনো বেদনাঘন মুহূর্তে, দামিনীরও যেন মনে হতে পারত : ‘দুঃখ বলে রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে।’ পূর্ণতায় আর অপূর্ণতায়, সফলতায় আর বিফলতায়, আনন্দে আর বেদনায় তখন একাকার হয়ে যায় সমস্ত অস্তিত্ব।”(ঘোষ। ২০২০। পৃ.১৯৭)

কাজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি শঙ্খ ঘোষের সমালোচনাটি রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচনার ধারায় সম্পূর্ণরূপে এক ভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি করেছে। এর আগে উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য ধারার সাপেক্ষে উপন্যাসের সমালোচনা হলেও একটি বিশেষ গানকে একটি চরিত্রের মানসিক স্থিতির ধ্রুবপদ হিসেবে ব্যবহার করে সমগ্র উপন্যাসের বিশ্লেষণ সমালোচনার ইতিহাসে ভিন্ন ঘরানার সৃষ্টি করে।

এই উপন্যাসের চর্চা ধারার শেষপর্বে বিশেষভাবে উল্লেখ্য উদয়কুমার চক্রবর্তীর ‘চতুরঙ্গ: সাধক কবির আলেখ্য’ গ্রন্থটি। এই উপন্যাস সম্পর্কিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে এটি বিশিষ্টতা লাভ করে নাস্তিকতা এবং চিত্রকল্পকেন্দ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে। অধ্যাপক চক্রবর্তী ‘গোরা’-র অব্যবহিত পরের এই উপন্যাসটির ধ্রুবপদ অন্বেষণকালে মন্তব্য করেছেন,

"গোরা উপন্যাসের বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর চতুরঙ্গ-র স্বল্পাবয়ব পাঠককে গভীরভাবে আত্মমুখীন করে। স্বভাবতই মনে হয়, ধর্মসম্বন্ধে এতখানি চূড়ান্তে রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনো উপন্যাসে যাননি। যদিও এই আস্তিক্যবাদী সাহিত্যিক ধর্ম সম্বন্ধে স্বল্পবাক মোটেও ছিলেন না, তবুও চতুরঙ্গ উপন্যাসে ধর্মের দুটি স্বরূপ-দর্শন, আমাদের এই ধর্ম বিষয়ক দিকটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে।

চতুরঙ্গে অস্তিও নাস্তির, সাদা ও কালোর, হ্যাঁ এবং না-র, আছে এবং নেই-এর দ্বৈত সম্মিলন ঘটেছে; যেমন ঘটেছে তার শেষ পর্বের কাব্যজীবনে। তত্ত্বের দিক থেকে অতিক্রান্ত কবিজীবনের রূপ-অরূপ, সীমা-অসীম প্রভৃতি ভাবনা এই উপন্যাসে প্রাধান্য পাবে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু, এই সর্ব-সম্মিলনে, দুটি ধ্রুবপদ রবীন্দ্রনাথ গেঁথে দিয়েছেন— দুটি সমধর্মী পুষ্পের মতো; একটি 'নাস্তিকতা' অন্যটি 'নিষ্ঠুরতা'। আমরা দেখব, এ দুটি আসলে একই প্রাণপুষ্পের দুটি ভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু, পরক্ষণেই দেখতে পাব 'আস্তিকতা'এবং 'নিষ্ঠুরতা'র মধ্যেও এক ধরনের যোগ রয়েছে।" (চক্রবর্তী। ২০১৬। পৃ.৭১)

আস্তিক্যবাদের একাধিকরূপ আমরা দেখেছিলাম পূর্ববর্তী উপন্যাস 'গোরা'য়। আর এই উপন্যাসে দেখা গেল আস্তিক্য এবং নাস্তিক্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আস্তিকতার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার না হলেও একটা নেতিবাচকতার সম্পর্ক আমরা দেখেছিলাম 'গোরা'-র হরিমোহিনীর মধ্যে; সেই নেতিবাচকতাই ক্রমে বর্ধিত হয়ে নিষ্ঠুরতার রূপ নিয়েছে 'চতুরঙ্গ'-তে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে; এমনকি শচীশও সেই নিষ্ঠুরতা প্রকাশের বাইরে যায়নি। আর এই দিকটির প্রতিই আলোকপাত করেছেন অধ্যাপক চক্রবর্তী।

৭. ঘরে-বাইরে:— 'গোরা'-কে নিয়ে সমালোচকদের চর্চা শেষ না হতেই ১৩২২ সালের বৈশাখ থেকে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় 'ঘরে-বাইরে' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচক ও পাঠকমহলে চূড়ান্ত আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এই উপন্যাসকে বহু সমালোচক ও গবেষক রাজনৈতিক-সামাজিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত করলেও তৎকালীন পাঠক এই ভিন্নধর্মী গঠন, ও কথনরীতির উপন্যাসের আঙ্গিকগত বিশেষত্বের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সমালোচনা করতে শুরু করলেন 'দুর্নীতি'-র অভিযোগের ভিত্তিতে। যদিও ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রজনী' উপন্যাসে এই একই কথনরীতির ব্যবহার করেছিলেন, তবুও ভাব ও ভাষার নতুনত্ব এবং উপন্যাসের বক্তব্যের বাস্তবতার পরিবর্তে অধিকাংশ সমালোচনার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছিল বিবাহিতা স্ত্রীর অপরপুরুষের প্রতি অন্যায় আকর্ষণ এবং সন্দীপের সীতাকে ঘিরে কটূক্তি। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের নানা সাহিত্য কর্মকে ঘিরে নানা বিরূপ মন্তব্য ও কটূক্তির ঢেউ উঠলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে সচরাচর সেই কটূক্তির উত্তর করেননি; যদিও তাঁর হয়ে কলম

ধরেছেন অনেকেই। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে'-তে এসে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিতর্ক ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছিলেন, যার লিখিত ভাষ্য পাওয়া যায় 'সাহিত্য-বিচার' গ্রন্থের 'টীকা-টিপ্পনী' প্রবন্ধে।

এই উপন্যাস নিয়ে 'সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা'য় প্রয়াসী যতীন্দ্রমোহন সিংহ যেমন উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র ক্লেদাক্ত মন্তব্য করেছেন বা অন্যদিকে সমালোচক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগ এনে মন্তব্য করেছেন সাহিত্যগত প্রসঙ্গের বাইরে এসে বা বলা ভালো ব্যক্তিগত আক্রোশের জায়গা থেকে— যা একটি সাহিত্য-কর্মের সমালোচনার নিক্তি হতে পারে না; সেখানে পাশাপাশি এই উপন্যাস নিয়ে কিছু সুচিন্তিত অভিমতও রেখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী বা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মতো বিদগ্ধ সমালোচকগণ। উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে যেখানে পরবর্তীতে বহু চর্চা হয়েছে সেখানে প্রমথ চৌধুরীর সুচিন্তিত মত গ্রহণীয়,

> "...'ঘরে-বাইরে'-য় আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি এঁকেছেন, কেননা ও উপন্যাসখানি একটি রূপক কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান ভারত।" (চৌধুরী। ১৯৯৫। পৃ. ১৩২)

কাকে বলব 'ঘর' আর কাকে বলব 'বাহির'; ভারতবর্ষ আর ইউরোপ নাকি নিখিলেশের অন্দরমহল আর বাহির বাড়ি অথবা এই তিন চরিত্রের অন্তরমহলের বার্তা আর লৌকিক জীবনের কার্যকলাপ; এই বিষয়গুলি নিয়ে নানান চর্চার প্রতিফলন উপন্যাসটির সমালোচনাকালে লক্ষিত হলেও প্রমথ চৌধুরীর উক্ত মন্তব্য আর তার বিশ্লেষণ বা আরো গভীরতর বিশ্লেষণী দৃষ্টির সাক্ষর রেখে রচিত 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মনোজ্ঞ সমালোচনাটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। সুরেশচন্দ্র তাঁর সমালোচনায় উল্লেখ করেন,

> "মানুষের মধ্যে দুটো 'আমি' রয়েছে- একটা স্পষ্ট, একটা অস্পষ্ট। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই স্পষ্ট আমিটাই হচ্ছে অসত্য, আর অস্পষ্ট আমিটাই হচ্ছে সত্য। ... মানুষের স্পষ্ট 'আমি'র সহস্র রাজাগিরির মাঝে তার অস্পষ্ট 'আমি'র অভিসার কারোরই চোখে পড়ছে না,— কারোরই মনে লাগছে না। মানুষের এই স্পষ্ট 'আমি' হচ্ছে সন্দীপ আর তার অস্পষ্ট 'আমি' হচ্ছে নিখিলেশ। সন্দীপ সে হচ্ছে বাইরের মানুষ, নিখিলেশ সে হচ্ছে অন্তরের ঠাকুর।–(চক্রবর্তী। ১৯৯৫। পৃ. ১৩৩)

প্রমথ চৌধুরী যেখানে প্রায় সমগ্র উপন্যাসটিকে দেশীয় আর ইউরোপীয় ঐতিহ্যের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মন্তব্যটি প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েডকৃত মনের ত্রি-স্তরীয় বিভাজনকে মাথায় রেখে গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। কিন্তু নিখিলেশকে যখন সমালোচক 'অন্তরের ঠাকুর' বলেন তখন আসলে এই হিসেবটা মেলে না। বরং বিষয়টা যদি উল্টো হত তাহলে হিসেবে মিলত। কারণ সন্দীপের লোভ, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তির উগ্রতা এসবই মনের একেবারে শেষের তলায় থাকা বিষয়, যা চাপা পড়ে থাকে সচেতন মনের প্রভাবে, যার সঙ্গে নিখিলেশের আদর্শগত অভিমুখকে মিলিয়ে নেওয়া চলে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার ধারায় পূর্বজ এই দুই সমালোচনা যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাস বিশ্লেষণের দিশা হয়ে উঠেছিল তা বলাবাহুল্য।

এরই সমান্তরালে আমরা রাখতে পারি ১৩২৩-এর 'বরিশাল হিতৈষী' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লেখা একটি সমালোচনাকে;

> "...বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম কৈ? সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, নভেল মাত্রই রবীন্দ্রনাথের এই লীলা প্রকট- 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি' সর্বদাই এই পরকীয়া পীরিতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। বাখানি সেই চুলচেরা কুশাগ্র লেখনী। কিন্তু একের স্ত্রী অপরকে লইয়া লীলাখেলা- এসব নভেলের বিষয় কেন? তাও যাক, বয়স থাকিতে একরূপ ছিল, আজ বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতনে'র রবীন্দ্রনাথ, উৎকট স্বদেশীর স্কন্ধে পরস্ত্রী চাপাইয়া দিয়া কি বীভৎস রস উপভোগ করিলেন, বুঝিলাম না।" (সম্পা. মুখোপাধ্যায়। ১৩৬৯। পৃ. ৫৪২)

যে-কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছিলো, যে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্মগুলি প্রকাশের সমকালে এক ধরনের সমালোচনার ধারা গড়ে ওঠে যাকে কোনোভাবেই সাহিত্যগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায় না; এগুলি গড়ে উঠেছিল সামাজিক নানান নিয়ম-নীতি থেকে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করা বা না করার জায়গা থেকে। কাজেই সমালোচকের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষ দৃষ্টি— তা এসমস্ত সমালোচনার ক্ষেত্রে সবসময়ই ব্যাহত হয়েছে। আর শুধু রবীন্দ্র-উপন্যাস নয়, রবীন্দ্রনাথের নাটক, কাব্য প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সাহিত্য-ধারাই এই জাতীয় একদেশদর্শীতা দোষযুক্ত সমালোচনার শিকার হয়েছিল।

আমরা জানি ‘ঘরে-বাইরে’- রবীন্দ্রনাথের চলিত বাংলায় লেখা প্রথম উপন্যাস। কাজেই এই উপন্যাস সমালোচনার ধারায় উপন্যাসটির ভাষা ব্যবহার নিয়ে বুদ্ধদেব বসু সহ আরো নানা বিশিষ্ট সমালোচকের নানান মনোজ্ঞ সমালোচনা পরবর্তীতে প্রকাশিত হলেও পত্রিকায় প্রকাশের সমকালে কিন্তু সেভাবে এর চলিত ভাষার ব্যবহার বিধি নিয়ে কোনো বিশেষ মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে কিছু প্রাচীনপন্থীদের মুখপাত্র হিসেবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির ভাষা ব্যবহারের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন;

> “একা রবীন্দ্রনাথ জনকয়েক চ্যালাচামুণ্ডার সাহায্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের ছাঁদ বদলাইতে পারিবেন না।”(বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৫। পৃ. ১৪৪)

যদিও এই মন্তব্য শুধু ‘ঘরে-বাইরে’-র চলিত গদ্য নিয়ে নয় ‘সবুজ পত্র’-এ প্রকাশিত চলিত ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গদ্য নিয়েও ছিল। প্রাচীনপন্থী সমালোচকেরা সাহিত্যক্ষেত্রে চলিত ভাষার ব্যবহারকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। তবে এই প্রথম রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচনার ধারায় প্রধানত ভাষার ভিন্নধর্মী ব্যবহার সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল ‘ঘরে-বাইরে’-র হাত ধরেই।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা’ গ্রন্থে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> “ঘরে-বাইরে’ গ্রন্থেই লেখক উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথম চলতি ভাষা ব্যবহার করিলেন, বোধ হয় ‘সবুজ পত্রে’র প্রভাবে। তাহার ফল যে ভালো হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গল্পবস্তুর গতিবেগ তাহাতে বাড়িয়াছে এবং বিষয়বস্তুকে তাহা সমৃদ্ধ করিয়াছে। ঘটনা সংস্থানের নাটকীয়ত্বও বোধ হয় তাহাতে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া epigram সুতীক্ষ্ণ শাণিত বাক্য-ভঙ্গিমায় বিরুদ্ধ-মতবাদের সংঘর্ষ যেভাবে দীপ্তিলাভ করিয়াছে তাহাও লক্ষণীয়।” (রায়। ১৩৫১। পৃ. ৩৫৪)

এরই পাশে আমরা রাখতে পারি বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটিকেও;

> “কোনো সন্দেহ নেই, ‘ঘরে-বাইরে’র ভাষায় আতিশয্য আছে। ‘চতুরঙ্গ’ যেমন কম ক’রে, এ যেন তেমনই বড্ড বেশি জোর দিয়ে বলা, বড্ড বেশি ঘি-মশলার রান্না, মোটের ওপর সব দিক থেকে বড়ই যেন বেশি। অলংকারের এমন প্রাচুর্য যে কথা গুলো প্রায়ই বক্তৃতা-ঢঙের হ’য়ে পড়ে, অপ্রশংসার অর্থে rhetorical। উক্তির অর্থে প্রশ্ন-ভঙ্গির অভাব নেই। প্রথম থেকেই চোখে পড়ে ‘যে’ আর ‘তো’ এই ছোটো দুটি শব্দের পৌনঃপুনিকতা। বাংলার এই অব্যয় দুটির কাজ হচ্ছে বাক্যের দেহে বিশেষ-কোনোর দিকে জোর চালিয়ে দেয়া— এ-জোর সবসময়

> দরকার হয় না, ঘন ঘন এলে ক্লান্তিকর হয়। অনেক সময় সেটা উচ্চারণ ক'রে বলতেও হয় না, প্রচ্ছন্ন থেকেই তা নিজের কাজ ক'রে নিতে পারে। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'তে এরকম কোনো ফাঁক রাখা হয়নি।" (বসু। ২০১৩। পৃ. ৮৯)

আমরা 'চতুরঙ্গ'-এর আলোচনাকালে উল্লেখ করেছিলাম যে বুদ্ধদেব বসু দুটি উপন্যাসকে একত্রে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই একত্র আলোচনার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল দুই উপন্যাসের ভাষা ব্যবহারের সদ্ভাব ও ভেদ-ভাব। ভেদ-ভাবটা কোথায়? 'চতুরঙ্গ'-এর ভাষার ক্ষেত্রে, বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে স্বল্পতা চোখে পরে 'ঘরে-বাইরে' তা একেবারেই নেই। 'চতুরঙ্গ'-এর শ্রীবিলাসের 'প্রেমচাদ-রায়চাঁদমার্কা' হওয়ার পরেও তার ভাষা প্রয়োগে যে বিনয় রয়েছে 'ঘরে-বাইরে'-এর তিন বক্তা চরিত্রের কারও মধ্যেই সেই বিনয়টা নেই; আর নেই বলেই প্রত্যেকের সংলাপ এবং বর্ণনার বাক্যবিন্যাস এত জটিল, এত রূপক, উপমা মণ্ডিত। আর এর ফলে ভাষার গতি ধীর হয়ে পড়েছে। সে ভাষা চলিত বাংলা হলেও তার হালকা চাল 'ঘরে-বাইরে'-তে ধরা পড়েনি। আর এই কারণেই 'ঘরে-বাইরে'-র ভাষা একই সঙ্গে নিন্দিত ও নন্দিতও বটে।

সুকুমার সেনের এই উপন্যাসের সমালোচনার মধ্যে বিস্তার ও বিশেষ যত্নের ছাপ পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে প্রথম চলিত ভাষার ব্যবহার ও আত্মকথনরীতি যা পর্যায়ক্রমে ঘুরে ফিরে এসেছে তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন সমালোচক। প্রতিটি চরিত্রের পূর্ণ বিশ্লেষণ এবং উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু আলোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। চরিত্রদের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির ভবিষ্যৎ কী ভাবে বিজড়িত হয়েছে সে সম্পর্কে সমালোচকের অনুসন্ধানী দৃষ্টির বক্তব্য;

> "সন্দীপের সহিত যেদিন বিমলার পরিচয়হইল সেইদিন নিখিলেশের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুর সহিতও বিমলার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ হইতে যে সে শেষ অবধি বাঁচিয়া যাইবে ইহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।" (সেন। ১৩৫৩। পৃ. ৪১৮)

বিমলা চরিত্রের সন্দীপের উগ্র দেশাত্মবোধক আহ্বানে উন্মুখ মনের সঙ্গে 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার সংকট, নিখিলেশের তত্ত্বসর্বস্ব ভালবাসা, যার গতি অতি সূক্ষ্ম এবং সন্দীপের মধ্যে গোরা চরিত্রের ছায়া পড়তে দেখেছেন সমালোচক। বিমলাকে 'সামান্যা' স্ত্রীলোকের মতো জ্ঞান ও গভীরতাহীন বিবেচনা করেই সমালোচক অন্বেষণ করেছেন কেন নিখিলেশের অপার অসীম ভালোবাসা সত্ত্বেও বিমলা সন্দীপের রক্ত মাংসের স্থূল লোলুপতায় নিজেকে ধরা দিতে

পারল। বিমলার মধ্যে সেই জ্ঞান, তপস্যা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অভাব ছিল যাতে নিখিলেশের বিশ্বাসী প্রেমিক হৃদয়ের অপার কিন্তু নিম্ন স্বরের প্রেমকে সে স্পর্শ করতে পারে; তাই সে তার ইন্দ্রিয়জ আবেগকে সন্দীপের লালসার কাছে সমর্পণ করতে পেরেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত নিখিলেশের বিশ্বাস ও প্রেমের অন্দরমহলেই ঘটেছিল বিমলার মোহমুক্তি। এই সমস্ত তত্ত্বকেই সুকুমার সেন সূক্ষ্ম তথ্যের বিভাজনে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। সমালোচনার শেষে শুধুমাত্র 'মানভঞ্জন' বা 'গোরা'-র সঙ্গে প্রতিতুলনাতেই শেষ করেননি। 'ঘরে-বাইরে'-র সঙ্গে মিল খুঁজেছেন বহু পুর্বে লেখা স্টিভেনসনের 'প্রিন্স ওট্টো' উপন্যাসের। এই উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার তুলনা করলেও 'ঘরে-বাইরে'-কে অধিকতর শিল্পসঙ্গত বলে মনে করেছেন তিনি।

'ঘরে-বাইরে'-তে এসে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী প্রত্যক্ষ করেছেন ধর্মের সঙ্গে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সহজ মিলকে। এই উপন্যাসের গঠন 'চতুরঙ্গে'র তুলনায় আরো বেশি পূর্ণতার মুখ দেখেছে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধের ধারণাকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলেই বুঝেছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদ কত ভঙ্গুর ও স্বার্থপর। আর তাকেই সমালোচক দেখেছেন সন্দীপ চরিত্রে আর রবীন্দ্রনাথের বন্দিত বিশ্বজনীন প্রেমের সহজ সুন্দর রূপায়ন খুঁজেছেন নিখিলেশে।

'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে অশ্রুকুমার শিকদার এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কার্যকারণ-পরম্পরা বজায় রাখার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন, এখন ঘরে বাইরে উপন্যাসে তিনি কালের মাত্রা বজায় রাখার দায়িত্বও ত্যাগ করলেন। সময়ের অঙ্গরেখা ধরে তিনি দরকার মতো উঠে গেছেন, নেমে এসেছেন। ইতিহাসের কাছ থেকে উপন্যাস পেয়েছিল যে সময় পরম্পরাগত বিন্যাস, তাকেও ভেঙ্গে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। কোথাও কোথাও কথকের কথা ঘটনার তাৎক্ষণিক বিবরণ, কখনো বা সময়ের ঈষৎ ব্যবধানে বলা, আবার কোথাও সমস্ত গ্রন্থিলতা খুলে যাওয়ার পরে পিছনে ফিরে তাকানো।" (শিকদার। ১৩৮০। পৃ. ৩৯-৪০)

অশ্রুকুমার শিকদারের মন্তব্যে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সময়ের ব্যবহারের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যা নিয়ে ইতিপূর্বে সেভাবে আলোচনা হয়নি। সময়ের স্বাভাবিক ক্রমকে ভেঙে অবিন্যস্ত ক্রমের যে অপূর্ব ব্যবহার এই উপন্যাসে ঘটেছে সেই বিষয়টিকে অধ্যাপক শিকদার যথার্থরূপে অনুধাবন করেছিলেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংকলনে এই উপন্যাস সম্পর্কে লিখলেন,

> "জীবনে অনেক কিছু ঘটে— সমাজ যাকে মানতে চায় না। যিনি আর্টিস্ট তিনি মনে মনে জানেন যে সমাজের চাইতে জীবনের দাবি বড়। রবীন্দ্রনাথ মনে যা জেনেছেন লেখনীর মুখে তা স্বীকার করতে পারেননি। জীবনের দাবিকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। এমন যে সন্দীপ তারও ব্যবহার অস্বাভাবিক। ... এই দ্বিধা এবং সংকোচ এটা সন্দীপের প্রকৃতিতে নেই এই দ্বিধাটুকু লেখকের নিজেরই।" (দত্ত। ১৯৫৯। পৃ. ৭১-৭২)

এরই সঙ্গে মিলিয়ে আমরা উল্লেখ করতে পারি উপন্যাসটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটিকেও। বুদ্ধদেব বসু আসলে "দুই বোন' ও 'মালঞ্চ" শীর্ষক প্রবন্ধে 'ঘরে বাইরে' নিয়ে কয়েকটি মনন-ঋদ্ধ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন,

> "...যারা সাংসারিক বিচারে এখনো প্রায় ছেলেমানুষ, দায়িত্বের দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়, তাদের সহজ, মধুর, সহনীয় পরিবেশ থেকে বয়স্কদের জটিল জগতে ভালোবাসাকে বদলি করলে ফলটা কী-রকম দাঁড়ায়, তার প্রথম পরীক্ষা হ'লো 'ঘরে-বাইরে'তে। সন্দীপ, নিখিলেশ, বিমলা, তিনজনেই পরিণত বয়সের মানুষ, ব্যক্তিগত ছাড়াও একটি বৃহত্তর সামাজিক জীবন আছে তাদের, তাই 'ঘরে-বাইরে'তে প্রথম থেকেই সর্বনাশের আভাস দেখা দিয়েছে। সেই সর্বনাশ লেখক শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে দিলেন— সন্দীপের প্রতি অবিচার ক'রে। অবিচার এই হিশেবে যে নিখিলেশকে জিতিয়ে দেবার জন্যই সন্দীপকে অযোগ্য হ'তে হ'লো। 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর প্রতি সামাজিক অবিচারে আমাদের মন যেমন ক্ষুব্ধ হয়, তেমনই অতৃপ্তি জাগে সন্দীপের প্রতি লেখকের এই ব্যক্তিগত বিমুখতায়। মনে হয়, বিমলার সত্য পরীক্ষা তো হ'লো না, লেখক মাঝখানে এসে আগুন থেকে তাকে আড়াল করলেন। সন্দীপকে প্রথমে যা মনে হয় সে যদি সত্যি তাই হ'তো— তেজস্বী, নির্ভীক, কামনার বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ কী করতেন? কেমন ক'রে বাঁচাতেন বিমলাকে?" (বসু। ২০১৩। পৃ. ১০৫-০৬)

ইতিপূর্বে 'নৌকাডুবি'-র সমালোচনাকালে রমেশ-কমলার সম্পর্কের যে অস্বাভাবিকতার প্রসঙ্গটি উঠে এসেছিলো, প্রায় সেই একই ধরনের মন্তব্য এই উপন্যাসের সমালোচনাকালেও সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। পরপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ স্থাপনের বিষয়ে 'নৌকাডুবি'-তে যে দ্বিধা রবীন্দ্র-রচনায় ফুটে উঠেছিল তারই কিছুটা পরিমার্জিত রূপ সন্দীপ-বিমলার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উপলব্ধি করা সম্ভব। একথা ঠিক, সন্দীপকে যেমন করে রবীন্দ্রনাথ আঁকতে চেয়েছিলেন, আগাগোড়া যদি তেমনটাই রাখতেন, অল্প একটু বিবেকের খোঁচা, অল্প-একটু দ্বিধার আবেশ, অল্প-একটু ভালো হওয়ার ইচ্ছা যদি তার মধ্যে না রাখতেন তাহলে 'ঘরে-বাইরে'-র পরিণতি অন্যরকম হতে পারত।

শচীন সেন তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নূতন সুর ও ঢং আসিয়াছে—... নিজের স্ত্রীকে বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত দেখিবার ইচ্ছা— এই দৃষ্টি অত্যন্ত আধুনিক। স্ত্রীকে গৃহের বাহিরে দশজনেরমধ্যে যাচাই করিয়া পাওয়াই সার্থক পাওয়া— ইহাতে যথেষ্ট আদর্শবাদ আছে, যা শাস্ত্রের, লোকাচারের, সমাজের ভালোমন্দের সুরে ধ্বনিত নয়। এই দৃষ্টি সমাজগত নয়, ব্যক্তিগত।" (সেন। ১৩৪৬। পৃ. ২২৩-২৪)

শচীন সেনের এই মন্তব্যের শেকড় খুঁজতে গেলে ঠাকুর-পরিবারের অন্দরমহলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। স্ত্রীকে সমাজের মধ্যে, বাইরের জগতে সকলের সামনে আনার ইচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে প্রবল ছিল, কারণ তিনি ছিলেন বিলাত ফেরত। বিলাতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের খোলামেলাভাব তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। 'ঘরে-বাইরে'-র আনুপূর্বিক পাঠ আসলে কিছুটা এই সত্যেন্দ্রনাথ আর জ্ঞানদানন্দিনীর সম্পর্কের প্রতিফলনকে স্মরণ করিয়ে দেবে। বিমলার পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত মেয়েদের শাড়ি পরার নতুন রীতি, সেমিজ-জ্যাকেটের ব্যবহারকে মনে করিয়ে দেবে।

শঙ্খ ঘোষ 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' শীর্ষক প্রবন্ধে এই উপন্যাসের আলোচনাকাল উল্লেখ করেছেন,

> "আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল; বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভলোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি।' এই কথা যখন নিখিলেশ লিখছিল তার ডায়েরিতে, তখন এই 'বাহির' অবশ্য সমস্ত দেশের অভিঘাত নিয়ে আসে না, এখানে এ বাহির শুধু বিমলা-সন্দীপের অবস্থানটিকে চিনে নেবার আয়োজন। কিন্তু একদিকে যখন এইভাবে নিখিলেশ 'নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে' গড়ে তুলতে চাইছে, অন্যদিকে ঠিক সেই সময়েই তার গোটা দেশেরও মূল্য সে বুঝে নিতে চায় ওই একই আত্মস্থতার পরিচয়ে। বিমলাকে নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে, তারই সমান্তরাল সংকট চলছে দেশবোধ নিয়ে, সন্দীপ আর নিখিলেশের মাঝখানে বিচ্ছেদের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিমলার মতো তাদের দেশও।" (ঘোষ। ২০১৪। পৃ.২৫৮)

নিখিলেশ যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে, যে আত্ম-অহমিকা নিয়ে বিমলাকে সকলের মাঝে বের করে আনার, জীবনের অন্দর আর বাহির এই দুই মহলকে সম্যকরূপে বুঝিয়ে দেওয়ার ও বুঝে নেওয়ার পরীক্ষায় নেমেছিল তা কিন্তু ভেঙে পড়েছিল সন্দীপের প্রতি বিমলার আকর্ষণের

প্রাথমিক স্তরকে অনুভব করেই। ফলে নিখিলেশের এই পরীক্ষা আসলে সমস্ত সমাজ-দেশ-কাল, দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে শুধুমাত্র বিমলা-সন্দীপের সাক্ষাৎ-স্থলটিতে এসে ঠেকে। নিখিলেশের মধ্যে হয়তো একটা আত্মপ্রত্যয় ছিল যে সমস্ত বহির্জগতের মধ্যে থেকেও শেষ পর্যন্ত বিমলা তারই চিরন্তন প্রেমিক-সত্তাকে বেছে নেবে; আর তাতেই যা ছিল শুধুমাত্র প্রজাপতির নির্বন্ধ তা হয়ে উঠবে যথার্থ আত্মিক মিলন। কিন্তু সন্দীপের আগমনে যখন বিমলার সমস্ত বোধ বিলুপ্ত হতে শুরু করল, দূরত্ব বাড়তে থাকল বিমলা-নিখিলেশের দাম্পত্যে তখন থেকে নিখিলেশ সমস্তকে ছেড়ে দেশের সাপেক্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। নিজের আত্মিক দুঃখকে যখন সে পরাধীন দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করতে বসেছে তখন সে নিজের মধ্যে নিজের পুনর্নির্মাণ করার তাগিদ খুঁজে পেয়েছে।

এই উপন্যাস-চর্চার শেষপ্রান্তে আমরা রাখতে পারি তপোধীর ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধ ‘ঘরে বাইরে: প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ’-কে, যা ‘উপন্যাস: তাৎপর্যের খোঁজে (পূর্বার্ধ)’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক ভট্টাচার্য উপন্যাসটির রচনাকাল এবং ঘটনাকালের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন;

> “রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ সম্পর্কে যেমন বলেছিলেন, ‘এ নাটক সত্যমূলক’ তেমনি ‘ঘরে বাইরে’ সম্পর্কেও বলা যায়, এই আখ্যান সত্যমূলক। তবে তা অধিকতর সত্য। উপন্যাসের প্রতিবেদনে বেশ কিছু ঘটনা এমন চিত্রিত হয়েছে যেসব নিজস্ব জমিদারিতে ঘটে যাওয়া অনাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মন্থন করে তিনি লিখেছিলেন। সবই ঘটেছিল যখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় আবেগ-সর্বস্ব দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। সেইসব বাস্তব যাদের নজরে পড়েনি বর্গগত অবস্থানের সীমাবদ্ধতার জন্যে, তাঁরাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ তুলে ধরেছিলেন।” (ভট্টাচার্য। ২০১৯। পৃ. ১১৩-১৪)

উপন্যাসটি প্রকাশের সমকালে বা অব্যবহিত পরবর্তীকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে শুধুমাত্র বিমলার বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম-সম্পর্ক এবং সন্দীপের সীতা সম্বন্ধীয় মন্তব্য কেন্দ্রিক একপাক্ষিক সমালোচনার ধারা প্রবাহিত হয়েছিলো তার অসাড়তার দিকটির প্রতি আলোকপাত করে অধ্যাপক ভট্টাচার্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন আসলে উপন্যাসটি কতখানি বাস্তবসম্মত। যেভাবে ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নিজের যৌবনের বহু ঘটনার পুনর্বয়ন করেছেন সেভাবেই ‘ঘরে-বাইরে’-তে এসেও রবীন্দ্রনাথ বাস্তব অভিজ্ঞতার আখ্যানই রচনা করেছেন। কাজেই যে সমস্ত সমালোচক বলে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না কিংবা রবীন্দ্র-সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তবসম্মত নয় তাঁদেরই যেন প্রতি-সমালোচনা করেছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রবন্ধে।

৮. যোগাযোগ:- 'চতুরঙ্গ'র পরে ১৯২৯-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাস 'যোগাযোগ'-এর থেকেই মূলত নব আবির্ভূত পত্র-পত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-রচনা প্রাচীনত্বের তকমায় ভূষিত হতে আরম্ভ করল। তিরিশের দশকের গোড়ায় আবির্ভূত 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকা দুটিকে ঘিরেই মূলত নবীন লেখকদের কলমে প্রাচীনরূপে গণ্য হতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। এতদিন দেশীয় শিক্ষায় দীক্ষিত প্রাচীনপন্থীরা যেখানে রবীন্দ্র-সমালোচনা করছিলেন দুর্নীতি বা অশ্লীলতার ভিত্তিতে সেখানে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠক, লেখক ও সমালোচকমহল একই মুদ্রার অপর পৃষ্ঠের মতো সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন রবীন্দ্রসাহিত্যে বাস্তবতার অভাব বোধ করে। আধুনিক সমালোচনার চর্চা বইল সেই খাত বেয়ে যেখানে বলা হল;

> "সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা; এমনকি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। ...রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত যে কবি-হৃদয় 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি' সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তাঁহার উপন্যাস গুলিতেও ছায়া ফেলিয়াছে।" (ভট্টাচার্য। ১৯৯৫। পৃ: ১৫৬)

ভাবলে অবাক হতে হয় ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ একসময়ে উপন্যাসের যে যে অংশ বা চরিত্র-চিত্রণের জন্য অশ্লীলতা ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে উপন্যাসগুলির প্রায় একই অংশ বা চরিত্রগুলির জন্য রবীন্দ্রনাথ সমালোচিত হতে আরম্ভ করলেন 'রিয়্যালিটি'র অভাবের ভিত্তিতে। রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার পত্রিকা কেন্দ্রিক ধারাবাহিকতার বিচারে আমরা এর গতিশীল প্রকৃতি অনুধাবনে ক্রমশ প্রয়াসী হয়ে উঠতে পারি। 'প্রগতি'-র ১৩৩৪-র পৌষ সংখ্যার পৃষ্ঠায় 'যোগাযোগ' উপন্যাস সম্পর্কে প্রকাশিত হয়,

> "যোগাযোগ রীতিমত affected জটিল ও artificial মনে হয়। মনে হয়, যথেষ্ট প্রয়াস করে চার পৃষ্ঠা ধরে রবীন্দ্রনাথ যে কথাটি বলেছেন, সে-কথা প্রেমেন্দ্র মিত্র অনায়াসে এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে বলতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে redundancy বা অতিশয়োক্তি-দোষ অত্যন্ত বেশি।" (পৃ. ২৭৭)

'যোগাযোগ' উপন্যাসের প্রধান সমস্যা হৃদয় সংক্রান্ত যা প্রকৃতপক্ষে বিবাহ ও তার সাফল্যের ওপর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বৈবাহিক সম্বন্ধের আন্তরিক মিলের পেছনে বালিকাবধূর শ্বশুরালয়ে

স্বামীর সাহচর্যে ও আশ্রয়ে, তারই বিশ্বাসে ও শিক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার মধ্যেই অনেকাংশে নির্ভরশীল— সুকুমার সেনের এই মন্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। তবে একথা সত্যিই যে এক বিশ্বাস ও শিক্ষা-রুচিতে পালিত হয়ে বিবাহ-পরবর্তীকালে শ্বশুরালয়ের শিক্ষা-রুচির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার বাধ্যবাধকতার যে যন্ত্রণা তাকেই হয়তো নির্দেশ করতে চেয়েছেন সমালোচক, কারণ এই সমস্যাটিই 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। বিপ্রদাস-কুমুদিনীর মধুর সম্পর্কের মধ্যে সমালোচক তাঁর পরিচিত রীতিতে যোগ খুঁজেছেন 'হৈমন্তী' গল্পের সঙ্গে। বিপ্রদাস চরিত্রের বিশ্লেষণকালে সমালোচক সুকুমার সেন দেখিয়েছেন,

> "কতকটা নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এবং কতকটা নিজের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাস ভূমিকার পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিপ্রদাসের কথায় রবীন্দ্রনাথ নিজেরই রসোপলব্ধির সুনিবিড় আনন্দ-বিষাদের পরিচয় পাই।" (সেন। ১৩৫৩। পৃ. ৪৪৭)

সুকুমার সেনের মতে আখ্যানভাগের স্বল্পায়তন সত্ত্বেও চরিত্রের বিশ্লেষণ ও তাদের সূক্ষ্মানুভূতির তাগিদ থেকে এটি উপন্যাস পর্যায়ে অঙ্গীভূত হয়েছে।

অন্যদিকে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "তিন-পুরুষে'-র মূল মনন-কল্পনার মধ্যে মহৎ উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল; সেই মনন-কল্পনা ভিন্নমুখী না হইলে হয়ত 'গোরা'র মত আরেকটি উপন্যাস সৃষ্টি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। কিন্তু 'যোগাযোগে' বিবর্তিত হইয়া 'তিন পুরুষে'র সে সম্ভাবনা ঘুচিয়া গেল। ...উপন্যাসটির আরম্ভ ও শেষ একান্তই আকস্মিক। ...গল্পবস্তুর গঠনও একটু শিথিল, গল্পের বিভিন্ন অংশ সুদৃঢ় সংহত নয়। ... এক-একবার মনে হয় কুমুদিনীর স্বামীগৃহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যদি গল্পের সমাপ্তি হইত তাহা হইলে 'যোগাযোগ' আরো দৃঢ় ও সংহত হইত। (রায়। ১৩৫১। পৃ. ৩৫৭-৫৮)

আমরা জানি 'বিচিত্রা'-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের কালে উপন্যাসটির নাম ছিল 'তিনপুরুষ'। প্রথমাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মনোগত ইচ্ছা ছিল তিন প্রজন্মের কাহিনিকে লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু পত্রিকায় দুই সংখ্যায় প্রকাশের পরেই তৃতীয় সংখ্যা থেকে নাম বদল হয়, নতুন নাম হয় 'যোগাযোগ'। ফলে অধস্তন তৃতীয় পুরুষ অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশতম জন্মদিনের একটা উল্লেখ দিয়ে যে উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল, তা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই অতীতকালে ফিরে গিয়ে পূর্ব-পুরুষদের কাহিনি এবং অবিনাশ ঘোষালের পিতা-মাতা মধুসূদন-কুমুদিনীর দাম্পত্য জটিলতার আখ্যান বর্ণনাতেই সমাপ্ত হয়ে গেল। ফলে উপন্যাস শেষে কুমুর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার

সংবাদ এবং উপন্যাসের সূচনায় অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন পালন উপন্যাসের মূল কাহিনির থেকে কিছুটা খাপছাড়াভাবেই স্থান লাভ করেছে। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিনের সংবাদটুকুকে বাদ দিয়ে দিলে বরং 'যোগাযোগ' স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারত।

গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী প্রবন্ধসংকলন' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে এই উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "তত্ত্বের কথা বাদ দিলে 'যোগাযোগ'-এর শিল্পকৃতী ত্রুটিহীন নয়। ... সামন্ত মুকুন্দলালের প্রতি লেখকের সহানুভূতি এবং মধুসূদনের প্রতি প্রকট অবজ্ঞা ঔপন্যাসিক শিল্প-সঙ্গতি নষ্ট করেছে। ... একদিকে রেনেসাঁসের অনুপ্রেরণা, লিবার্টি চিন্তা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, 'ইম্পার্সোন্যাল' সতীধর্মে অনাস্থা, অন্যদিকে সামন্তসমাজের বনেদী আভিজাত্যের মোহ, অর্থ-মোক্ষের ঊর্ধ্বে দৃষ্টি, বাজে-খরচের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও বড় ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। রবীন্দ্র-মানসের এই দ্বিধার ফলেই চরিত্রাঙ্কনে বিপর্যয় ঘটেছে।" (গুপ্ত। ১৯৬১। পৃ. ৭৪)

একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস রচনাকালে নিরপেক্ষ ঔপন্যাসিক হতে পারেননি। যে নিরপেক্ষতা তিনি 'গোরা'-র রচনাকালে দেখিয়েছিলেন সেই নিরপেক্ষতার অভাব তাঁর এই উপন্যাসের সর্বাঙ্গে জড়িত। কুমু-বিপ্রদাসের পিতা মুকুন্দলালের বাৎসরিক মোচ্ছবকে জমিদারতন্ত্রের আভিজাত্যের একটা দিক থেকে দেখানোর প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আগাগোড়া থেকে গিয়েছে। বণিক সমাজের প্রতিভূ মধুসূদনের প্রতি, তার প্রতিটি ক্রিয়ার প্রতিই রবীন্দ্রনাথের তীর্যক দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নের সম্মুখে ফেলে দিয়েছে। অথচ সেভাবে দেখতে গেলে মধুসূদনের উত্থানের সঙ্গেই কিন্তু ঠাকুরবাড়ির উত্থানের যোগ বেশি। ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস, তাদের ভঙ্গজ কুলীন দশা, গ্রামত্যাগ, ব্যবসা করে ক্রমে ক্রমে আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখা— এসবই মধুসূদনের পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে অধিক সাযুজ্য মণ্ডিত। তবুও রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মমতা কেড়ে নিয়েছে চাটুজ্যে পরিবার ও মুকুন্দলালের উদ্দাম মোচ্ছব।

মনোরঞ্জন জানা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

> "দুই বিরুদ্ধ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া এই যে ট্র্যাজেডির বীজ তাহারই একটি পুষ্পিত বিকাশ 'তপতী' নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তপতীর মতো কুমুদিনীর জীবনও সম্পূর্ণ অধ্যাত্মময়। দুইজনেই আলোকের দূতী। ইহাদের সংসারে ভোগের বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় না। মধুসূদন জাতিতে বৈশ্য। রাজা জাতিতে ক্ষত্রিয়। ভোগ-বাসনার প্রকাশের মধ্যে, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্পৃহার মধ্যে তাই কিছু পার্থক্য আছে।" (জানা। ১৯৬০। পৃ. ৩৩৮)

ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি রবীন্দ্র-নাটক, কাব্য কিংবা ছোটোগল্পের সঙ্গে উপন্যাসগুলিকে সমান্তরালে রেখে বিশ্লেষণের একটা প্রবণতা সমালোচকদের মধ্যে অব্যাহত ছিল। আসলে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের একটি বিশিষ্ট ধারা সমালোচনার এই প্রবণতার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে। আলোচনা শুরুর মুখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্লেষণ নিয়ে যে তত্ত্বটির উল্লেখ করা হয়েছিলো, তাতে আমাদের বক্তব্যের মূল কেন্দ্র ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজেকে বারবার ভেঙে গড়ে তোলার প্রবণতাটির প্রতি। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ভেঙে পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ করেন, এবং এই জায়গা থেকেই 'করুণা'-র সঙ্গে 'চোখের বালি', কিংবা 'করুণা'-র সঙ্গে 'যোগাযোগ' অথবা 'যোগাযোগ'-এর সঙ্গে 'তপতী'র মিল খুঁজে নেওয়া সম্ভব হয়।

৯. শেষের কবিতা:— এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ যেখানে তরুণ লেখকদের কাছে প্রাচীন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছিলেন, সেখানে যেন তাঁদের খানিক চ্যালেঞ্জ জানানোর ভঙ্গিতেই রচনা করে ফেললেন 'শেষের কবিতা'। এই উপন্যাসের বাকভঙ্গি থেকে গঠন সবই বিশিষ্টতায় পূর্ণ এবং এই কারণে এই উপন্যাস নিয়ে সর্বাধিক চর্চা করল তৎকালীন আধুনিক লেখক ও সাহিত্য সমালোচকগণ। সে আলোচনা পরে উত্থাপন করা গেলেও রমাপ্রসাদ চন্দের 'শেষের কবিতা'-র সমালোচনা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এই উপন্যাস প্রকাশের বেশ কিছু সময় পরে 'মাসিক বসুমতী'-র ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'গোরার কথা এবং শেষের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে রমাপ্রসাদের কয়েকটি মন্তব্য পরবর্তী রবীন্দ্র-উপন্যাসের চর্চাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সংযুক্ত করা গেল,

> ক. "পুরুষ চরিত্রে পুরুষ সাহিত্যিকের নিজেকে নিজে লঙ্ঘন না করিয়া শুধু বিশ্লেষণের জোরে উপন্যাস লেখা চলিতে পারে। কিন্তু পুরুষ লেখক নিজেকে লঙ্ঘন করিতে না পারিলে স্ত্রী-চরিত্র গড়িতে পারেননা। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।"
>
> খ. "মনে মনে লাবণ্যও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া রবীন্দ্রনাথ বনিয়াছিল।" (চন্দ। ১৩৬৯। পৃ. ৩৩৬-৩৩৭)

চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতার এই অভিযোগ পরে বহুবার উঠলেও রমাপ্রসাদের এই অভিযোগ ও বিশ্লেষণ অনেকাংশে অভিনব। পরবর্তীকালের বহু সমালোচকই এই স্বীকারোক্তি রেখেছেন যে উপন্যাসের চরিত্ররা প্রায়শই তাঁর নিজেরই অপর স্বর হয়েই থেকেছে; রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি।

এই উপন্যাসের একটি সমালোচনা মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর 'রবি প্রদক্ষিণ' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয় কিন্তু প্রথমাবস্থায় এটি 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ' নামেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

> "বাহিরের আঘাত কবিকে চিরদিনই বেশী করিয়া অন্তরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে, 'প্রত্যহের কুশাঙ্কুর তাঁহার চরণে যখনই বিঁধিয়াছে তখনই তিনি দেশ ও কাল অতিক্রিম করিয়া শাশ্বত সুন্দরের আরতি করিয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য রচনায় সেই কুশাঙ্কুরের ক্ষতচিহ্ন আমরা খুঁজিয়া পাই না। ...। 'শেষের কবিতা'-য় সেই ব্যথার চিহ্ন আছে; সেই ব্যথাকে কবি কেমন করিয়া আত্মযথ করিতেছেন- তাঁহার হৃদয়ের রসায়নাগারে তাঁহার সেই রস-পরিণতির প্রক্রিয়াটিকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই কারণেই এই রচনায় রসের একটি নূতনতর স্বাদ আছে।" (মজুমদার। ১৩৬৯। পৃ. ৩৪৫)

মোহিতলালের এই সমালোচনাটি বিশেষভাবে মনোগ্রাহী। এর অন্যতম কারণ, ইতিপূর্বে চলে আসা উপন্যাসের ঘটনা বা চরিত্রের সরল স্বাভাবিক বিশ্লেষণের পথে না এগিয়ে মোহিতলাল বিদগ্ধ যুক্তি ও জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়ে নতুন যুগের সমালোচকদের রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা, সেই সমালোচনার রূপ এবং প্রকৃতিসহ সমস্যাগুলির কথাও দু'একটি বাক্যের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করতে করতে অগ্রসর হয়েছেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে প্রাচীনত্বের তকমায় যে প্রবল আঘাত ও বেদনার সঞ্চার হয়েছিলো এবং তারই ফলশ্রুতি যে 'শেষের কবিতা' তারও উল্লেখ করেন। মোহিতলালের এই বিদগ্ধ সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি পাঠের আগে বুঝে নেওয়া দরকার উপন্যাসটি রচনার সমকালীন পরিস্থিতিকে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও সাহিত্য প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ নব্য সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা, রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। একদল বলতে শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথে রিয়্যালিটি নেই, শুধু মধুর কল্পনা রয়েছে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন হয়েছেন, তিনি আধুনিক যুগে অচল, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধ্রুপদী ঘরানাতেই থাকুন ইত্যাদি; এঁদের নানান কটূক্তি যে রবীন্দ্রনাথকে নানা ভাবে বিচলিত করেছিল তা আমরা যেমন মোহিতলাল বা বুদ্ধদেব বসুর 'শেষের কবিতা'-র পাঠ প্রতিক্রিয়া থেকে জানতে পারি তেমনই জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকেও (চিঠিপত্র ১১। ১৪১৪। বিশ্বভারতী)। অমিত চরিত্রের বিশ্লেষণকালে মোহিতলাল দেখান তার মধ্যেও মিশে রয়েছে এই আধুনিক সাহিত্যিকদের মনোভাব। মোহিতলাল বা সুরেশচন্দ্রের মতো মানুষেরা এই সময়ে যে রবীন্দ্রনাথের

পক্ষাবলম্বন করে কথা বলেছিলেন, এবং সাহিত্যে রিয়্যালিটি প্রয়োগের নামে অহেতুক পঙ্কিলতা আনয়নের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তা বলাবাহুল্য।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমসাময়িককালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা ১৩৩৩ এর ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে তিনি একদিকে যেমন বাংলা উপন্যাস ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমের থেকে রবীন্দ্রনাথ মূলত উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনের বিচারেই যে পৃথক হয়ে বিশিষ্ট হলেন সেই বিষয়টির উল্লেখ করলেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প ও উপন্যাসেরও একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন।

"শেষের কবিতা"-র গদ্য-পদ্যের মিলিত আখ্যানদেহ ও অপূর্ব প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ যেখানে সর্বকালে সর্বস্থানে নন্দিত হয়েছে সেখানে সুকুমার সেন এই উপন্যাসে পেলেন রবীন্দ্র-মানসে রূপ পাওয়া বৈষ্ণবীয় পরকীয়া তত্ত্বের নবরূপায়ন। কাব্যগন্ধী এই উপন্যাসের সমালোচনাকালে ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণের থেকেও তিনি অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন প্রেম সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্বকে যা এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে স্থান লাভ করেছে।

'শেষের কবিতা'কে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী দেখেছেন 'একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর কবিতা' রূপে।

> "'মিতা' ও 'বন্যা' নাম দুটির মধ্যেও নরনারীর প্রেমানুভবের ব্যঞ্জনা-সঙ্কেত রয়েছে বলে মনে করি। লাবণ্যের নারী চেতনার অতলে অমিত কেবল 'মিতা'- বস্তুক সম্পর্কের দাবি সে অনুভবের পক্ষে কেবল অবান্তর নয়, অসম্ভবও। মিতার কাছে লাবন্য কেবল 'বন্যা', প্রাণের গভীরে প্রেমের পাত্রকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে তোলে সে,- কিন্তু সেই পূর্ণতার মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকে না, দেয় না ধরা।" (চৌধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৭০)

এর কাব্যধর্মীতার পাশাপাশি উপন্যাসের স্বাদও অখণ্ড হয়ে আছে এর ছত্রে ছত্রে। 'শেষের কবিতা'-এ প্রেমের যে রূপ ও অরূপের দুই দিক, দীঘির জল আর ঘড়ার জলের সঙ্গে তুলনা করে যে চিরন্তনী ভাব প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার সুচারু বিশ্লেষণ করেছেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংকলনে এই উপন্যাস সম্পর্কে লিখলেন,

> "...স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু দু-পাতা লিখতে-না-লিখতে লেখক আপন গল্পের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। ...স্যাটায়ার প্রথম পরিচ্ছেদেই শেষ। মানুষের

> যৌবনলীলা কবিমনকে চিরকাল উল্লসিত করে এসেছে। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। যে যুবকদের উদ্দেশ্যকরে বিদ্রুপ বর্ষণ করবেন ভেবেছিলেন তাদেরই যৌবন রসে মন তাঁর অভিষিক্ত হল।"(দত্ত। ১৯৫৯। পৃ. ৭৪)

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'আধুনিক' প্রমাণ করতেই 'শেষের কবিতা' রচনায় হাত দিয়েছিলেন, 'স্যাটায়ার' তার উদ্দেশ্য ছিল ঠিকই, উপন্যাস রচনা করতে করতে আপন গল্পের জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন একথাও ঠিক— কিন্তু তাতে 'স্যাটায়ারে'র তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। উপন্যাসে আগাগোড়া অমিতকে ঘিরেই সেই 'স্যাটায়ারে'র রস গড়ে উঠেছে। 'স্যাটায়ার' এবং 'উইট'-টাও সেখানেই যে অমিত রবীন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করে যাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান সেই নিবারণ চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাথেরই 'কাউন্টার সেলফ';- অর্থাৎ আধুনিকও তিনি এবং শেষ পর্যন্ত অমিতকেও যার কবিতার আশ্রয় নিতে হল তিনিও সেই কবি রবীন্দ্রনাথই। কাজেই 'স্যাটায়ার' আর 'উইট' দুটোই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে রয়ে গেছে।

'শেষের কবিতা'-র প্রাথমিক পাঠ-প্রতিক্রিয়ার অতর্কিত চমককে এড়িয়ে সমালোচক বুদ্ধদেব বসু আরো একবার সমালোচনার জগতে বিস্ময়কর প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন। উপন্যাসটির শুধুমাত্র ভাষা ব্যবহারের ইতি এবং নেতিবাচকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বুদ্ধদেব বসু দেখালেন ভাষা এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে শাপ এবং বর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> "সে সময়ে যেটা আমাদের মনে সবচেয়ে চমক লাগিয়েছিলো সেটা 'শেষের কবিতা'র ভাষা। অমন গতিশীল, অমন দ্যুতিময় ভাষা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আমরা পড়িনি। এরকম ভাষা যে বাংলায় সম্ভব তাও আমাদের কল্পনার অগোচর ছিলো। ক্রিয়াপদের স্বল্পতার দরুণ বাংলা গদ্যের অত্যন্ত ধীর মেজাজটা প্রথম থেকেই পীড়া দিচ্ছিলো আমাদের, সেটাকে বেশ দ্রুত ও তীক্ষ্ণ ক'রে তোলাই ছিলো আমাদের লক্ষ্য।" (বসু। ২০১৩। পৃ.৯৩)

এবং, একদিকে যেমন এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের অপপ্রয়োগের কথা জানালেন তেমনই উপন্যাসের অংশ বিশেষের উল্লেখ করে দেখালেন এই কবিত্ব মণ্ডিত গদ্যের জন্যই এই উপন্যাসের শেষ রক্ষা। এর অন্যতম ত্রুটি হিসেবে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন,

> "শেষের কবিতা'র সংলাপ, তাহ'লে, এই কারণে দূষ্য যে, এতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ভাষা ব্যবহার করেননি, প্রায় সকলের মুখেই অমিত রায়ের বুলি বসিয়েছেন।... তবু, সব সত্ত্বেও একথা এ-কথা মানতেই হয় যে'শেষের কবিতা' শিল্পসৃষ্টি হিশেবে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাষারই জন্য। নাটকীয় সংস্থানের মধ্যে যা অসংগত, সংলাপে যা অংশত অবাস্তব, তার আন্তরিক মূল্যটি বুঝতে হ'লে আমাদের তাকাতে হবে বর্ণনা বা আখ্যানের দিকে, যেখানে রবীন্দ্রনাথই বক্তা। সেখানে তাঁর কবিত্বের স্বরাজ্যে তিনি মুক্তি পেয়েছেন; সেই আলোজ্বলা, ছন্দে-বাঁধা লাস্যময়

> গদ্যের স্বাদ নিতে-নিতে আমাদের মনের অবস্থাটা হয়— রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই বলি— যেন 'পদ্মের মাঝখানে ভ্রমরের মতো।" (পৃ.১০০-১০১)

ইতিপূর্বে বহু সমালোচকের একাধিক সমালোচনায় রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে যে মূল আপত্তির জায়গাটা উঠে আসছিল সেই নেতিবাচকতাকেই ইতিবাচকতায় পরিবর্তন করে বুদ্ধদেব দেখালেন 'শেষের কবিতা'-র প্রায় কোনো প্রধান চরিত্রকেই স্বাভাবিক মনে হয় না, কারণ এরা প্রত্যেকেই একটা পর্বের পর অমিত রায়ের 'এপিগ্রাম' সর্বস্ব প্যাঁচ খাওয়া বুলি আওড়েছে। শুধু যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বাধীনভাবে নিজের কবিত্বমণ্ডিত গদ্যের (অমিতের সংলাপ এবং ভাবনাজগত) পরিচয় রেখেছেন সেখানেই পাঠকচিত্ত স্থির হয়।

রবীন্দ্র-সমালোচক শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' প্রবন্ধে সুচারু রূপে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন কেন বুদ্ধদেব বসুদের এই উপন্যাস পাঠের প্রাথমিক চমক অতর্কিতে কেটে যায়; কেন তাঁদের পরিণত বয়সে এই উপন্যাসকে দুর্বল বলে মনে হয়েছিল; কেন অমিত চরিত্রকে এক ফাঁপা মানুষ বলে মনে হয়েছিল। রানী মহালানবীশের লেখা 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে'-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছেন উপন্যাসে অমিতের সেই সাহিত্যসভায় রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রসঙ্গ এবং নিবারণ চক্রবর্তীর আখ্যান আসলে উপন্যাসের মূল অংশ লিখে ফেলার বেশ কিছু সময় পরে যুক্ত হয়, ফলে অমিতের রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রসঙ্গটা খাপছাড়া হয়ে পড়ে। এবং তাতেই অমিত চরিত্র, তার রবীন্দ্র-বিরোধিতা, লাবণ্যর সঙ্গে নিবারণ চক্রবর্তী বনাম রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক-সত্তা নিয়ে বিতর্ক— এসমস্ত প্রসঙ্গগুলিই মূল উপাখ্যান ভাগ থেকে আলগা হয়ে পড়েছে, এবং তাতেই বুদ্ধদেব বসুসহ অন্যান্য সমালোচকদের পরিণত বয়সে এই উপন্যাসটি হালকা হয়ে গেছে।

শ্রীপুলকেশ দে সরকার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' গ্রন্থে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "... রবীন্দ্রনাথ বনাম নিবারণ চক্রবর্তী এককালে একদল আধুনিক কবি রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত হওয়ার যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্র-গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারেননি, এতে তাঁদের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। ...অমিতর আড়ালে নিবারণ চক্রবর্তীর মধ্যে আসলে রবীন্দ্রনাথেরই অস্তিত্ব বিরাজমান।" (সরকার দে। ১৩৬৮। পৃ. ৯৪)

যে কথা কিছু পূর্বেই উল্লেখ করলাম তারই জের টেনে বলা যায় নিবারণ চক্রবর্তীকে নিজেরই 'কাউণ্টার ইমেজ' হিসেবে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসলে বুঝিয়ে দিতে

চেয়েছেন যে 'অতি-আধুনিক'-ও আসলে তিনিই এবং ধ্রুপদী ঘরানাও তিনিই। একথা ঠিক 'শেষের কবিতা' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের অস্মিতা বোধ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তিনি কিছু পরিমাণে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলেই 'যোগাযোগ'-এর পর থেকে তাঁর উপন্যাসের ধরন, রীতি, ভাষা সবই কিছুটা কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেও কিছুটা সংশয়ান্বিত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা নিয়ে, এবং এই কারণেই 'শেষের কবিতা' রচনার আর কয়েকবছরের মধ্যে তিনি উপন্যাস রচনার জগত থেকে বিদায় নেবেন চিরতরে; যদিও কাব্য-প্রবন্ধ-গান-নাটক-চিত্রকলাতে এসময়কালেই তিনি অতি উজ্জ্বল, নির্বিকার, নির্ভীক।

'গোরা'-র ঘটনা ও রচনাকালের হিসেবের গতমিলের মতোই এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যে কালগত একটা অমিল ঘটেছে সেই বিষয়টির প্রতি নির্দেশ করে ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'রবীন্দ্র উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে' গ্রন্থে বলেছেন;

> "গল্প-নির্দেশিত পূর্বকালের সঙ্গে জোড় মেলাতে এখানেও হিসেবের টানাপড়েন একটু ঘটেই, তবু মিলছুট হয় না একেবারে। যোগমায়ার স্বামী বরদাশঙ্কর ২৭ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছিলেন; গল্পের উত্তর পর্বে তাঁর ছেলে যতিশঙ্কর কলেজের পড়ুয়া, মেয়ে পড়তে পারত বিদ্যালয়ে। বরদাশঙ্করের পিতামহ জ্ঞানদাশঙ্কর 'বাংলাদেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের' জড়ো হাওয়ায় প্রগতির পালে ভর করেছিলেন। সে-যদি উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে না হয়ে চতুর্থ দশকেও হয়—তাহলেও, বরদাশঙ্করের জন্ম সময় ঐ শতকের অষ্টম দশকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি টেনে নামানো খবই অসম্ভব হয় না। অন্যপক্ষে অমিত-এর শিলং পাহাড় বাসের সময় যদি 'সুনীতি চাটুজ্যের' বই-এর নিরিখে ১৯২৬-২৭ হয়, আর যতিশঙ্করের বয়স তখন কুড়ির ঘরে পৌঁছে থাকে, তাহলে বরদাশঙ্করের মৃত্যুর সময় বিশ শতকের প্রথম দশকেই এসে পৌঁছোয়। যোগমায়া তখন সদ্য কুড়ি বছর পেরোবার কথা, গল্পের শিলং পর্বে তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।" (চৌধুরী। ২০১৬। পৃ. ৮০-৮১)

রবীন্দ্র-উপন্যাসের আলোচনার ধারাবাহিকতার খাতে উক্ত গ্রন্থটির বিশেষত্ব তার বিষয় নির্বাচনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

১০. দুই বোন এবং ১১. মালঞ্চ:— 'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চ'- এই ক্ষুদ্র উপন্যাস দুটি অধিকাংশ সমালোচকের হাতেই একযোগে বিশ্লেষিত হয়েছে। সমালোচক সুকুমার সেন উপন্যাস দুটিকে একযোগে বিশ্লেষণকালে দেখিয়েছেন কী ভাবে একই প্রেম-সম্পর্কিত সমস্যার দুই পিঠ প্রায় একই প্লটের আঙিনায় দুই ভিন্ন উপন্যাসের আখ্যানভাগে ধরা

দিয়েছে। তিনি তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্প আলোচনার চতুর্থ পর্যায়ে রেখেছেন 'চার অধ্যায়', 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'-কে এবং এদের উল্লেখ করেছেন 'পূর্ণতা পর্যায়ের গল্প উপন্যাস' হিসেবে। সমালোচক ভূদেব চৌধুরীও 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'-এর সমালোচনাকালে চিরাচরিত প্রথারই অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ দুটি উপন্যাসকে একযোগে বিচার করেছেন। কারণ সবার মতো ভূদেব চৌধুরীর মতেও এই দুটি উপন্যাসের প্লট আসলে একই; উপন্যাসের বিস্তার বা চরিত্রের জটিলতার কোনটিই তিনি এই দুটি উপন্যাসে খুঁজে পাননি। ভূদেব চৌধুরীর সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় রবীন্দ্র-সমালোচনার বিশেষত্ব উপন্যাসগুলির কাব্যময়তা অন্বেষণে। প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের আলোচনাতেই তিনি খুঁজেছেন কবি-রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপ, পেয়েছেন সমকালে লেখা কাব্যগ্রন্থগুলির সমমনোভাবের স্পর্শ। আর এখানেই ভূদেব চৌধুরীকৃত রবীন্দ্র-সমালোচনাটির বিশেষত্ব।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে উপন্যাস দুটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "দুই বোন' গল্পের পরিসর অতি সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত। প্রেমের মনস্তত্ত্ব ও তাহার জটিল মানসিক দ্বন্দ্বলীলাই যে-গল্পের উপজীব্য সে গল্প আরো বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাহা না হওয়াতে গল্পের ঘটনা ও বিবরণ অনেক জায়গায়ই অসংলগ্ন ও আকস্মিক বলিয়া মনে হয়; ইতি ও যুক্তি পারম্পর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" (রায়। ১৩৫১। পৃ. ৩৯৪)

এবং,

> "মালঞ্চ' 'দুই বোন' অপেক্ষা অনেক বেশি নিষ্ঠুর নির্মম। মনে হয়, যে-কথা লেখক 'দুই বোনে' বলতে চাহিয়াছিলেন, একটা বিশেষ পরিকল্পনার মধ্যে বয়স্ক বিবাহিত পুরুষের নবীন প্রণয়োদগমে ত্রিভুজপ্রেমের সমস্যাটিকে যে-ভাবে দেখাতে চাহিয়াছিলেন, সেই গল্পে তাহা নিঃশেষে দেখা এবং দেখান হয় নাই। বোধ হয় এই জন্যই অল্পকাল পরেই 'মালঞ্চ' রচনার প্রয়োজন হইল।" (পৃ. ৪০০)

নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যের সাপেক্ষেই আমরা উল্লেখ করতে পারি বুদ্ধদেব বসুকৃত সমালোচনার প্রসঙ্গটিকে। বুদ্ধদেব বসু 'দুই-বোন' এবং 'মালঞ্চ' এই দুই উপন্যাসের একযোগে সমালোচনাকালে বুদ্ধদেব বসু পাঠককে উদ্দেশ্য করেই যেন প্রশ্ন তুলেছেন 'ঘরে-বাইরে'তে নিখিলেশ এবং সন্দীপের সত্য প্রকাশিত হলেও যথার্থরূপে বিমলার আন্তরিক সত্য কি প্রকাশিত হতে পেরেছে? লেখক স্বয়ং যেন পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে বিমলাকে সন্দীপের

লালসা থেকে রক্ষা করলেন; এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই শেষ বয়সে বিবাহিত দম্পতির মাঝে তৃতীয় ব্যক্তিকে এনে ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনি গড়ে তুলেছেন উক্ত দুই উপন্যাসে; যার কোনোটিরই পরিণাম স্বস্তিদায়ক নয়। দুই উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণকালে বুদ্ধদেবের কলমে প্রাধান্য পেয়েছে 'মালঞ্চ'-র নীরজা এবং 'দুই-বোন'-এর শশাঙ্ক। নীরজা চরিত্রের প্রতি লেখকের অমানবিকতা এবং শশাঙ্কের প্রতি সূক্ষ্ম কৌতুক কীভাবে দুই উপন্যাসের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে তার সুচারু ব্যাখ্যা করেছেন বুদ্ধদেব। তবে একথা ঠিক আয়তনের অতি-ক্ষুদ্রতা এই দুই উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র বা ঘটনার পারম্পর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১২. চার অধ্যায়:— আমরা কিছু পূর্বেই জেনেছি সমালোচক সুকুমার সেন 'চার অধ্যায়'-সহ তার পূর্বের দুটি উপন্যাসকে বলেছেন 'পূর্ণতা পর্যায়'-এর উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসটির আলোচনাকালে একে 'কবির লেখা গল্প' বলেই বক্তব্য শেষ করেছেন। এই বিতর্কিত উপন্যাস সম্পর্কে যে এর থেকে অধিক আকর্ষণীয় কোনো মন্তব্য করা হল না তাতেই বোঝা যায় তিনি এই উপন্যাসে এসে আবার ফিরে গেলেন রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ কবিসত্ত্বার খোঁজে। এই একটি বাক্যেই শেষ পর্যায়ের এই উপন্যাসটি সম্পর্কে যাবতীয় প্রশংসা ও ত্রুটি নির্দেশ করা হয়ে গেল একযোগে।

বরং রাজশেখর বসুর 'চার-অধ্যায়'-এর আলোচনাটি তুলনায় বিশিষ্টতার দাবি জানাতে সক্ষম হয়। এই ক্ষুদ্র সমালোচনাটি 'প্রবাসী' পত্রিকার মাঘ ১৩৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। রাজশেখর তাঁর এই ক্ষুদ্র আলোচনায় এই উপন্যাসটির গঠনের বিশিষ্টতার উল্লেখে লেখেন,

> "...'চার অধ্যায়' গল্প ভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা। তার লক্ষণ 'আভাস' শীর্ষক মুখবন্ধ। তাঁর কোনও আধুনিক গল্পে মুখবন্ধ নেই।" (বসু। ১৩৬৯। পৃ. ৩৫৩)

এই আলোচনার বিশেষত্ব এক জায়গাতেই যে এই উপন্যাস নিয়ে যে তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হবে সে কথার আভাস রাজশেখর খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বলাবাহুল্য আমরা সকলেই জানি এই উপন্যাসে একদিকে চরমপন্থী বিপ্লবী-বাহিনীর কার্যকলাপের সমালোচনা এবং অপরদিকে 'আভাস' অংশে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পর্কে একটি উক্তির জন্য নানা পক্ষের জটিল আক্রমণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হয়, এবং সেই জটিল বিতর্কের উত্তর তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪২ এর বৈশাখ সংখ্যায় করেন। এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত

উল্লেখ এই অংশে সংযুক্ত করা হল না কারণ ‘চার অধ্যায়’-কে নিয়ে সেই বিতর্ক ও সমালোচনা সেই সময়ে প্রায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে হচ্ছিলো, সাহিত্যিক ভাবনাগত দিক থেকে নয়।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংকলনে এই উপন্যাস সম্পর্কে লিখলেন,

> “‘চার-অধ্যায়’-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে দেহের জিজ্ঞাসা উগ্র হয়ে উঠবার অবকাশ পায়নি কিন্তু প্যাশনের বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণেই আমরা দেখতে পেয়েছি এবং তাতেই ‘চার-অধ্যায়’-এর কাহিনী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।” (দত্ত। ১৯৫৯। পৃ. ৭৮)

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ‘ঘরে-বাইরে’ থেকেই চরিত্রদের মধ্যে যৌনতা নির্ভর প্রেমের বহিঃপ্রকাশের অন্বেষণ করে গিয়েছিলেন। আসলে সবটুকু বলে না দেওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্ম শৈল্পিক-চেতনা রয়েছে তা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সমালোচক দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস’ প্রবন্ধে ‘ঘরে-বাইরে’ এবং ‘চার-অধ্যায়’-এর স্বদেশী কর্মকাণ্ডের প্রতি আলোকপাত করে বলেছেন,

> “সন্ত্রাসবাদ ও অসহযোগে রবীন্দ্রনাথের অনাস্থা সর্বজনবিদিত, কেননা সাহিত্যকর্মে তিনি কখনো আত্মগোপন করেননি। কিন্তু ভাষণ মঞ্চে যা শোভা পায়, উপন্যাসে একদেশদর্শিতা হেতু তা-ই রসহানি ঘটায়। অগভীর রাষ্ট্রবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকও জানেন সন্ত্রাসের পথে মুক্তি আসে না;রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারে দেশ হয়ে পড়ে উপলক্ষ্য, তখন উত্তেজনা-উদ্দীপনাই প্রধান। কারণ, “দেশ মৃণ্ময় নয়, দেশ চিন্ময়”। কিন্তু দেশের জন্য সমর্পিত প্রাণ যে তরুণ হৃদয়গুলি সেদিন চরম ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলো, প্রাণ বিসর্জনে তিলমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নি, তারা সকলেই নীতি-বর্জিত, চোর, চোরের অনুচর কিংবা নেতৃত্ব মোহগ্রস্ত ছিল, একথা সত্য নয়। তাহলে ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, সূর্য সেনদের আত্মত্যাগ দেশের পক্ষে আবর্জনা মুক্তির সামিল। অবশ্যই তা রবীন্দ্রনাথের মত নয়। ... কিন্তু সন্দীপ, ইন্দ্রনাথ, অতীন্দ্র ছাড়াও যে সন্ত্রাসবাদের অন্যদিক ছিল, তা রবীন্দ্র-উপন্যাসে অনালোচিত।” (গুপ্ত। ১৯৬১। পৃ. ৭৮)

আসলে ‘যোগাযোগ’ যে কারণে একদেশদর্শীতা দোষযুক্ত বলে অভিহিত হয়, একইভাবে ‘চার-অধ্যায়’-ও সেই দোষমুক্ত নয়। কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালো-মন্দ বোধ তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাকে গ্রস্ত করেছে— যার সূচনা ‘যোগাযোগ’ থেকেই হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যে মত ব্যক্তি বিশ্বাস করে তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা মতের সবটুকুই ভুল, কালিমালিপ্ত এমনভাবে ভাবাটা ঠিক নয়; কিন্তু উপন্যাসের পরিবেশনে ও ঘটনাক্রমে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে, ফলে নেতিবাচক সমালোচনাও হয়েছে বিস্তর। ‘চার অধ্যায়’ ভারতবর্ষের যে গুরুত্বপূর্ণ কালকে কেন্দ্রে রেখে

রচিত তার যথার্থ রূপ চিত্রণের জন্য উপন্যাসটির আয়তনগত দিক থেকে আরো কিছুটা বিস্তার পাওয়া উচিৎ ছিল; আয়তনের অতি ক্ষুদ্রতা ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বকে যথার্থরূপে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীপুলকেশ দে সরকার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' গ্রন্থে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> "এলার যে জীবন তা একটি ভাব মাত্র। এ ভাব বিদ্রোহের ভাব। বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। সুতরাং, ভূমিকায় কেবল এলার জন্মবৃত্তান্তই নেই, পর-শাসনের পরিচয়ও আছে। এই পরশাসন হচ্ছে এলার মা। পরশাসনের গর্ভেই এলার জন্ম। গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছে নিপীড়িত জনসাধারণের ঔরসে। তিনি এলার পিতা। মা বা পরশাসন কেমন? 'মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না।'বাতিকের কারণ শাসকপক্ষের বিদেশী সত্তার চেতনা। তারা যে বিদেশী ইংরেজ-শাসকেরা একথা এক মুহূর্তও ভোলেনি এবং এই সজাগ চেতনাই তাঁদের সমগ্র শাসন ব্যবস্থাকে সর্বদা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। সুতরাং ঐ উঁচু-নীচুর, শাসক-শাসিতের বৈরী চৈতন্য বাতিকে পরিণত হয়েছে। তাঁদের শাসিতের প্রতি ব্যবহারও তাই 'বিচার-বিবেচনার' 'প্রশস্ত পথ' ধরে চলেনি। দক্ষ লেখক রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন চিত্তে সুনির্বাচিত শব্দ ও ভাষায় তৎকালীন সমাজের ভাব গোপন ও প্রকাশ করেছেন।" (সরকার দে। ১৩৬৮। পৃ.৬৮)

সমালোচক পুলকেশ দে সরকারের 'চার অধ্যায়'-এর সমালোচনাটি ইতিহাসে বিশিষ্টতা অর্জন করতে সক্ষম। ইতিপূর্বে প্রমথ চৌধুরী কিংবা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী যেমন 'ঘরে-বাইরে'-র আখ্যানভাগকে রূপক-সাংকেতিকতার নিরিখে বিশ্লেষণ করেছিলেন খানিকটা সেভাবেই সমালোচক পুলকেশ দে সরকার 'চার অধ্যায়'-এর ভূমিকাংশের ব্যাখ্যা করেছেন। এলার পিতা-মাতার সম্পর্কের মধ্যে সমালোচক খুঁজে পেয়েছেন শাসক আর শাসিতের মধ্যেকার সম্পর্ককে। ইতিপূর্বে উপন্যাসের 'আভাস' অংশের পরিপ্রেক্ষিতে নানান সমালোচনা রবীন্দ্রনাথকে বিদ্ধ করেছিল, যার অভিমুখ ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক। সেই সমালোচনার পরে উপন্যাসের 'আভাস' অংশটিকে বাদ দেওয়া হয়; কিন্তু সমালোচকের মতে এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শাসক-শাসিতের সম্পর্ককে একইসঙ্গে ব্যক্ত ও গোপন করে গেছেন। অর্থাৎ, ভূমিকাংশটি আসলে শুধুমাত্র এলার জন্মবৃত্তান্ত নয়, তা আসলে বিপ্লববাদের জন্মের বৃত্তান্ত— সাংকেতিকতার প্রেক্ষিতে যাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। 'চার অধ্যায়'-এর এই ব্যাখ্যা এর পূর্বে এই রীতিতে যে হয়নি তা বলাবাহুল্য।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘কথাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থের শেষপর্বের আলোচনা সমাপ্ত করেছেন ‘চার অধ্যায়’-এর আলোচনাতে।

> “সারা বইটি জুড়ে পাত্র-পাত্রী কেবল কথা ব’লে যাচ্ছে— অবিশ্রান্ত, অনর্গল কথা; ঘটনার সংঘাত, চরিত্রের ব্যঞ্জনা, এবং এ-বইয়ের যা মূল বিষয়, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সবই প্রকাশ পেয়েছে— যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে— মুখের কথায়।...এরকম সংলাপ সমর্থনযোগ্য হ’তে পারে দুটো কারণে: প্রথমত, এই ভাষাটাই একটা স্বতন্ত্রশিল্পকর্ম ব’লে গণ্য; দ্বিতীয়ত, বক্তারা সকলেই সংস্কৃতিবান মানুষ হ’লে এর স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথের সংলাপের নিজস্ব গৌরব স্বতঃসিদ্ধ, বক্তারাও— অধিকাংশ স্থলে— অযোগ্য নন। আমাদের আঘাত লাগে শুধু সেইখানে যেখানে যোগমায়া বা যতিশঙ্কর অমিত রায়ের প্রতিধ্বনি করে; কিংবা কানাই গুপ্তর কথা শুনে তাকে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব’লে ভুল হয়।” (বসু। ২০১৩। পৃ. ১১৭-১৮)

উপন্যাসের সংস্থান বিন্যাস থেকে শুরু করে এর সংলাপে ব্যবহৃত ভাষার কৃত্রিমতা নিয়ে বাস্তবসম্মত আলোচনা রেখেছেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসু ইতিপূর্বে যে সমালোচনাগুলি করেছেন সেগুলির অধিকাংশতেই তিনি উপন্যাসগুলির ভাষা ব্যবহারের প্রতিই আলোকপাত করেছেন। ইতিপূর্বে ‘শেষের কবিতা’-কে যেখানে সমালোচনা করেছিলেন তার সব চরিত্র অমিতের ভাষাতে কথা বলে, এই জায়গা থেকে সেখানে ‘চার অধ্যায়’-এ এসে সমালোচক বসু ঠিক উল্টো অভিযোগটাই আনলেন। কানাই গুপ্তের মতো পুলিশ কনস্টেবলের পক্ষে যে রাবীন্দ্রিক গদ্য আওড়ানো সম্ভব নয়, এবং বটুসহ সমস্ত চরিত্রের মুখে এই রাবীন্দ্রিক গদ্য প্রয়োগের ফলেই যে উপন্যাসটি বাস্তবসম্মত হয়ে উঠতে পারেনি সে বিষয়টির প্রতি সমালোচক আলোকপাত করেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের এটা একটা সমস্যা যে প্রায় সব উপন্যাসগুলির চরিত্রদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বর অতি-প্রকট হয়ে ওঠে। চরিত্র, তাদের শ্রেণি, সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সংলাপ প্রস্তুত করতে পারেননি; আর এই বিষয়টির প্রতিই বুদ্ধদেব বসু বারংবার আলোকপাত করে গেছেন।

উপন্যাসগুলিকে নির্দিষ্ট করে সমালোচকদের সমালোচনা ছাড়াও আলোচনার উপান্তে এসে আমরা উল্লেখ করব রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কথা। এটি গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর “রবীন্দ্র উপন্যাসের শিল্পরূপ”। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী আলোচনা করেছেন উপন্যাসগুলির গঠনগত দিকটি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির গঠন-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান এই গ্রন্থটিতে সমালোচক রায়চৌধুরী মূলত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৮৪ সালে প্রথমবারের

জন্য প্রকাশিত গ্রন্থটির অভিমুখ নির্ধারিত হয়েছিল মূলত পার্সি লুবকের 'The Craft of Fiction' এবং হেনরি জেমসের 'The Art of Fiction'-গ্রন্থ দুটির নিরিখে। উপন্যাসের গঠন-সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থদুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হলেও সেই আলোচনার ধারা একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে অনেকটাই পরিবর্তিত ও বিবর্তি হয়েছে, যুক্ত হয়েছে নানান পরিভাষা, উপন্যাসের সময়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বহু উপবিভাগে ভাগ করে। কাজেই সমালোচক রায়চৌধুরী উপন্যাসের গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পর্ব-সূচনা করেছেন একথা ঠিক, কিন্তু বর্তমানকালের প্রেক্ষিতের থেকে দেখলে প্রতিটি উপন্যাস ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। কাহিনি বিন্যাস কিংবা সময় অথবা চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাদের গঠনগত দিকগুলির বহু উপবিভাগের আলোচনার অনুপস্থিতি সমালোচনা ক্ষেত্রকে অসম্পূর্ণ করেছে।

আলোচ্য অধ্যায়টি সন্দর্ভপত্রে যোগ করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল বর্তমানকাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার প্রবহমান ধারাটি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা। রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চা সম্পর্কিত সমস্ত গ্রন্থকে এই অধ্যায়ে স্থান দেওয়া সম্ভব না হলেও যে গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলির নিরিখে রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচনার প্রতি আলোকপাতের প্রচেষ্টা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় একদম সূচনাকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ আলোচনাই গড়ে উঠেছে মূলত কাহিনি, চরিত্র এবং ঘটনার ধারাবাহিকতাকে কেন্দ্র করে। বহু ক্ষেত্রে আলোচনা হয়েছে সমকালে রচিত রবীন্দ্র-ছোটোগল্প, প্রবন্ধ এবং কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে প্রতিতুলনার ভিত্তিতে। এসমস্ত আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রতুল হয়ে ধরা দিয়েছে উপন্যাসগুলির গঠন-পদ্ধতিগত আলোচনা। বিচ্ছিন্নভাবে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর 'রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণশিল্প' শীর্ষক গ্রন্থ কিংবা উদয়কুমার চক্রবর্তীর 'চতুরঙ্গ: কাহিনী উপস্থাপনার রীতি' নামাঙ্কিত প্রবন্ধের উল্লেখ এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হলেও মোটের ওপর প্রতিটি উপন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গঠনগত আলোচনা সেভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর এই অসম্পূর্ণতার বিষয়টিকে স্মরণে রেখেই আমাদের সন্দর্ভপত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলি আলোচিত হবে সম্পূর্ণভাবে উপন্যাসগুলির গঠনকে কেন্দ্র করে এবং এক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হবে আখ্যানতত্ত্ব।